স্বপ্নঘোর

এক

কেয়ার ফোন এবার রিসিভ না করে পারলো না সৈকত। এগারবারের সময় ও কেয়ার ফোন ধরলো। গত দশ মিনিটে কেয়া দশবার ফোন করেছে। সৈকত ওর ফোন ধরেনি। আসলে ও কেয়ার ফোন ধরতে চায়নি। তাই যতবারই কেয়ার ফোন এসেছে, ও কেটে দিয়েছে। কিন্তু কেয়াও যেন আজ নাছোরবান্দা। এক মিনিট যেতে না যেতেই ফোন করছে। ব্যাপারটা ভীষণ বিরক্তিকর। কেয়ার ফোন নিয়ে সৈকত অস্বস্থির মধ্যে রয়েছে। ওর সামনে সুমন বসে আছে। সুমনের পাশে বসে আছে অহনা নামের এক মেয়ে। ওরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। আলোচনা শুরু হতেই কেয়ার ফোন এলো। সুমনের সামনে কেয়ার ফোন ধরা যায় না। সৈকত ওর ফোন না ধরে কেটে দিচ্ছিলো। কিন্তু কেয়া থেমে থেমে ফোন করে যাচ্ছিলো। এমন কখনো হয়নি। কেয়া সাধারণত একবার ফোন করে। ফোন না ধরলে আর ফোন করেনা। শুধু তাই নয়, এরপর সৈকতকে অনেকবার ফোন করতে হয়। কেয়া ওর ফোন কেটে দেয়। অন্তত ৮ থেকে ১০ বার ও সৈকতের ফোন কেটে দেবে। এসএমএস করে অনেকবার ম্যাসেজ দেবে সৈকত। এক সময় ফোন ধরবে কেয়া। ফোন ধরেই রাগের একটা ঝড় বইয়ে দেবে। সৈকত ওই ঝড়ে কাচুমাচু হয়ে যায়। কেয়ার মধ্যে এক ধরনের অহংকার আছে। রাগের উত্তাপ আছে। অভিমানের খরস্রোতা নদী আছে। ওর চরিত্রে রহস্যময় এক আকাশও আছে। ওর কথায় ঝাল আছে, ফুল ফুটনো হুল আছে এবং একরাশ মাদকতাও আছে। আর তাই সৈকত কেয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সবসময় বিহবল হয়ে যায়। অথচ কেয়ার রূপের সৌন্দর্য, চরিত্রের রহস্য বা কথার মাদকতা সযতনে সৈকতের উপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু ও তা পারেনি বা এখনো পারছে না। বরং সমুদ্রের মোহনায় নদীর ছুটে চলার মতো ও ছুটে চলছে নীরবে এবং নিরুপায় হয়ে। এ এক ধরনের আত্মসমর্পণ। খুব অল্প সময়ে কথাগুলো ভেবে নিল সৈকত। ফোন বেজে ওঠতেই ও ফোন ধরলো। অস্বস্থিতে ও ক্ষীণ কণ্ঠে বললো,

'হ্যালো'।

অপর প্রান্তে কেয়া কালবৈশাখী ঝড় হয়ে ওঠবে ভেবেছিল সৈকত। কিন্তু তা হলো না। সৈকতকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে শান্ত গলায় কেয়া বললো,

'তুমি কি কোনো জরুরি কাজে ব্যস্ত?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা মিটিংয়ে আছি। মিটিং শেষ হলেই তোমাকে ফোন করছি। কেমন?'

'ঠিক আছে। মিটিং শেষ করেই আমাকে ফোন করবে। ভুলে যেওনা কিন্তু!'

কেয়া সাবধান করে দেয় সৈকতকে। যেন ফোন করতে ভুলে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। অন্যসময় হলে সৈকত হয়তো এ নিয়ে কেয়াকে একটা খোঁচা দিত। আর এতেই গড়

গড় করে কেয়ার মুখ থেকে বের হয়ে আসতো ঝাল কথার পাথর। কিন্তু এই মুহূর্তে কেয়াকে খোঁচা দেয়া যাবে না। ও নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,

'না ভুলবো না। মিটিং শেষ করেই তোমাকে ফোন দেব।'

'মনে থাকবে তো? খুব জরুরি কিন্তু!'

'মনে থাকবে। যদি একেবারেই ভুলে যাই, দুই ঘন্টা পর তুমি ফোন দিয়ো।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

কেয়া ফোন রেখে দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সৈকত। ওর দিকে কৌতুহলী চোখে তাকিয়ে আছে সুমন। সুমনের চোখে চোখ রাখতে ওর বুকের ভেতরটা একটু কাঁপলো। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে ব্যক্তিগত কিছু গোপন থাকে না। কোন কিছু গোপন করে রাখাও যায় না। ঘনিষ্ঠ বন্ধু মানে নিজের প্রতিবিম্ব দেখার স্বচ্ছ আয়না। নিজের সবরকম অপরাধও বন্ধুর কাছে অকপটে স্বীকার করে নেয়া যায়। সব কথা খুলে বলা যায় বা বলতে হয়। এ কথা জানে সৈকত। কিন্তু কেয়ার কথা খুব যত্ন করেই সুমনের কাছে গোপন রেখেছে ও। কতদিন গোপন রাখতে পারবে, কে জানে! সৈকত চোখ নামিয়ে নিল। ও তাকালো অহনার দিকে। অহনা কেমন ভাবলেশহীন। চিন্তিত। বিষণ্নতা মিশ্রিত এক ধরনের উদাসীনতা ওর চোখে-মুখে। সুমন বললো,

'তুই ফোনটা এবার বন্ধ কর। আমরা ভীষণ একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলাপ করতে যাচ্ছি।'

সুমনের কথায় সৈকত ফোন টার্ণ অফ করে ফেললো। কী বিষয়ে ওরা বসেছে, এখনো সৈকত জানে না। তবে সুমন ওকে বলেছে, খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওকে প্রয়োজন। সৈকতের সাহায্য দরকার। সুমন যখনি ওকে ডাকে সৈকত অনায়াসে চলে আসে। না ডাকলেও আসে। ওকে আসতে হয়। রাজনীতি ওকে নিয়ে আসে। সুমন ধনীর দুলাল, ব্যস্ত ব্যবসায়ী। সৈকত একজন সাধারণ রাজনীতিবিদ। কলেজ জীবন থেকেই ও রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সুমন ব্যবসা ছাড়া কিছুই বোঝে না। দু'জনের জীবন-যাপন এবং লক্ষ্য ভিন্ন হলেও দুই বন্ধুর মধ্যে প্রগাঢ় একটা হৃদয়িক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। সৈকত মাঝেমাঝে পার্টির জন্য সুমনের কাছে চাঁদা নিতে আসে, সুমন কখনো ওকে ফিরিয়ে দেয় না। আবার সুমন ওকে যখন কোন কাজের জন্য ডাকে, সৈকতও ছুটে আসে। আজ ওরা সুমনের অফিসে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয নিয়ে আলোচনায় বসেছে।

মতিঝিলের ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকায় সুমনের অফিস। লাঞ্চ আওয়ার। সুমন আগেই পিয়নকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। সুমনের অফিসে এলে বেশির ভাগদিন ঘরোয়া'র ভূনা খিচুড়ী খায় সৈকত। ঘরোয়া'র খিচুড়ী ওর ভালো লাগে। সৈকত এ কথা ভাবতেই ক্ষুধা টের পেল। কিন্তু মুখে কিছু বললো না। অহনা মেয়েটিকে ও চিনে না। মাত্র পরিচয় হয়েছে। তা-ও শুধু ওর নামটা জেনেছে। ও কে, কেনো এসেছে-তা ও জানে না। নিশ্চয় সুমনের কেউ হবেন। ও বুঝতে পারছে, অহনা কোনো সমস্যা নিয়ে সুমনের কাছে এসেছে। সুমন যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে, বা সমাধান করে দেয়। ও নিজে

কোনো সমস্যার সমাধান করে না বা করার চেষ্টাও করে না। ব্যবসায়ীদের সেই সময় কোথায়? ব্যবসায়ীরা অর্থ খরচ করে সমস্যার সমাধান খুব সহজে করে ফেলতে পারে। সমস্যা বুঝে তারা লোক ঠিক করে। এ সব জানে সৈকত। অনেকদিন ধরেই ও এ সব দেখে আসছে। অহনার সমস্যাটা যাই হোক, ওর সমস্যার সমাধান সৈকতকে করতে হবে, এটুকু ও বুঝতে পারছে। তাই সমস্যাগ্রস্থ অহনার সামনে নিজের ক্ষুধার কথা বলাটা শোভনীয় নয় বলে ও চেপে গেল। সৈকত সুমনের তাকিয়ে তাড়া দেবার ভঙ্গিতে বললো,

'সুমন, কেন জরুরি তলব করেছিস, বলতো!'

'অতো অস্থির হচ্ছিস কেন? বস। জরুরি কথা আছে।'

বললো সুমন। সুমন অহনার দিকে তাকিয়ে বললো,

'আমরা কি আলোচনা শুরু করতে পারি?'

অহনা মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলো। সুমন এবার সৈকতের দিকে তাকালো। বললো,

'তোর সেল ফোনটা বন্ধ করেছিস?'

'হ্যাঁ, করেছি।'

'শোন, তোকে একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'কী কাজ?'

'অহনাকে তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, তাইনা?'

'পরিচয় মানে, বললি তার নাম অহনা। নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ!'

এ কথা বলে সৈকত মুচকি হাসলো। অহনার চোখে লাজুক হাসির দ্যুতি ঝিলিক দিয়ে ওঠলো। সুমন হেসে বললো,

'ওর বিস্তারিত পরিচয় হচ্ছে, ও আমার কাজিন। থাকে অষ্ট্রেলিয়ায়। ওরা ওখানেই সেটেলড্। লেখাপড়া করছে আইটি নিয়ে। দু' দিন আগে ও ঢাকায় এসেছে। দু' সপ্তাহ থাকবে। এই দু' সপ্তাহে ও একজন লোককে খুঁজে বের করতে চায়। আমার ধারনা তুই ওকে সাহায্য করতে পারবি।'

সুমনের কথা শুনে সৈকত বললো,

'একজন লোক খুঁজে বের করা এমন কঠিন কাজ কি? নাম ঠিকানা দে। দু' সপ্তাহ লাগবে না। দু' দিনেই বের করে ফেলবো।'

এবার অহনা বললো,

'আমরা ছেলেটির নাম শুধু জানি। পরিচয় বা ঠিকানা জানি না।'

'মানে!'

অহনার কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে সৈকত। সুমন বললো,

'এই জন্যইতো তোকে ডেকেছি। যদি নাম ঠিকানা জানতাম, তবে তোকে ডাকবো কেন? আমার ড্রাইভারকে পাঠালেই তো ছেলেটিকে ধরে আনা যেত।'

'তোর কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি কি ম্যাজাশিয়ান বা গোয়েন্দা যে, একজনের নাম বলবি, আর অমনি আমি লোকটিকে তোদের সামনে এনে হাজির করে দেবো!'

‘আহা! তুই খেপে যাচ্ছিস কেন? শান্ত হ।’
‘আসল ঘটনাটা কি, খুলে বলতো!’
সৈকতের কথায় সুমন বললো,
‘রাতুল নামে একটি ছেলে অষ্ট্রেলিয়ার লেখাপড়া করতো। হঠাৎ করে ও ঢাকায় চলে এসেছে। এরপর থেকে তার কোন খোঁজ নেই। ওই রাতুলকে খুঁজে বের করতে হবে। রাতুল সম্পর্কে ওর নাম ছাড়া আর কোন তথ্য জানা নেই অহনার। বিষয়টি বুঝতে পারছিস?’
‘বুঝতে পারছি। রহস্যের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিস।’
অহনা বললো,
‘সত্যিই ভীষণ রহস্যের মধ্যে পড়েছি। এই রহস্য থেকে বের হতে চাই আমরা, আই মীন আমার পরিবার। রাতুলকে খুঁজে বের করতেই হবে। প্লিজ, আমাকে সাহায্য করুন!’
‘কিন্তু পুরো বাংলাদেশে কতগুলো রাতুল থাকতে পারে, জানেন? রাতুল কোন শহরের থাকতে পারে, গেইস করেছেন? বা ওর পরিবার কোথায় থাকে, তা জানেন কি?’
‘সঠিক বলতে পারবো না। তবে আমাদের ধারনা ওরা ঢাকাতে থাকে। আসলে, ওর নামটা ছাড়া আমরা ওর বিশদ কিছু জানিনা। এটাই আমাদের সমস্যা।’
সৈকত চট করে অনেক কিছু ভেবে নিল। অষ্ট্রেলিয়াতে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়ার জন্য যাচ্ছে। বর্তমানে ১৫ হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী অষ্ট্রেলিয়ায় রয়েছে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া গেছে এমন ছাত্রের মধ্যে ক’জনের নাম রাতুল, তা বের করতে পারলেই ঘুরপাকের বৃত্তটা কমে আসবে। অষ্ট্রেলিয়া হাইকমিশনের পিআরও সৈকত রুশদীর সঙ্গে ওর পরিচয় আছে। তার সহযোগিতা নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় অধ্যায়নরত ছাত্রদের একটি তালিকা বের করা যেতে পারে। ঐ তালিকা থেকে রাতুল নামের সকল ছাত্রদের পরিচয় ও ঠিকানা বের করলে নির্দিষ্ট রাতুলকে খুঁজে বের করা সম্ভব। সৈকতের চিন্তামগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সুমন বললো,
‘কী ভাবছিস?’
‘ভাবছি, হয়তো রাতুলকে খুঁজে বের করা যাবে।’
‘সত্যি! সত্যি, বলছেন!’
অহনা বিস্ময়। সৈকত অহনার বিস্ময়কে উপক্ষো করে সুমনের দিকে তাকিয়ে বললো,
‘এতে আমার কী লাভ হবে, বন্ধু?’
সুমন হেসে বললো,
‘গুড, তুই লাভের কথা তুলেছিস। তোকে এর জন্য পারিশ্রমিক দেয়া হবে। মোটা অংকের পারিশ্রমিক!’
‘তাই নাকি! কত!’
সৈকতের প্রশ্নে অহনা বললো,
‘একলাখ টাকা দেবো।’

'একলাখ মাত্র!'
সৈকত রসিকতা করে কথাটি বললো। অহনা বললো,
'না, না, দুই লাখ দেবো।'
'দুই লাখ?'
'ঠিক আছে তিন লাখ, চলবে?'
অহনার প্রশ্নে মৃদু হাসলো সৈকত। সুমনও মিটিমিটি হাসছে। অহনা বিব্রত হলো। ও সৈকতের দিকে তাকিয়ে ফের বললো,
'আপনার জন্য অংকটা কি কম হয়ে গেছে? কাজটা করুন, প্রয়োজনে আরো টাকা দিতে প্রস্তুত। পাঁচ লাখ হলে চলবে?'
'চলবে।'
বলে হাসলো সৈকত। এই কাজের জন্য পাঁচ লাখ টাকা আয় কম কথা নয়। এমন কাজ ও কখনো পায়নি। ওর খুব মজা লাগছে। ও বুঝতে পারছে না, রাতুলকে খুঁজে বের করতে এতো টাকা খরচ করতে চাচ্ছে কেন অহনা। ও এ নিয়ে প্রশ্ন করলো না। সুমন সৈকতের দিকে তাকিয়ে বললো,
'তাহলে তুই কাজটা নিলি?'
'হ্যাঁ, নিলাম। পাঁচ লাখ টাকা তো কম নয়! যদিও কাজটি করতে পারবো কিনা, জানিনা।'
'তুই চেষ্টা করলে পারবি।'
'আমার প্রতি এতোটা ভরসা করা ঠিক নয়। যাকগে, কাজটা কীভাবে করবো এবং এর ফলো-আপ কিছু থাকলে কাকে জানাবো?'
জানতে চাইলো সৈকত। জবাবে সুমন বললো,
'এই মুহূর্ত থেকে তোর সঙ্গে অহনা প্রতিদিন যোগাযোগ করবে। তোরা ফোনে কথা বলতে পারিস। আবার দু'জনে দেখাও করতে পারিস।'
'মন্দ নয়!'
বলে হাসলো সৈকত। সুমন বললো,
'অহনা ঢাকায় জন্ম নিলেও কিশোর বয়স থেকে ও অষ্ট্রেলিয়ায়। তোর সঙ্গে ও ঘুরে বেড়ালে ওর ঢাকা শহরটাও দেখা হয়ে যাবে। তুই যেখানে যেখানে যাবি, অহনাকে সঙ্গে নিতে পারিস। বুঝলি? আমি চাচ্ছি, ও ঢাকা শহরটা ভালো করে দেখে যাক।'
'সে দেখা যাবে।'
মাথা নাড়লো সৈকত। অহনা বললো,
'আমি আপনার সঙ্গে ঘুরলে আপনার আপত্তি আছে? আই মীন, আপনার কাজের কোন সমস্যা হবে?'
অহনার কথায় সৈকত কৌতুহলী চোখে তাকালো ওর দিকে। অহনার মত ডানাকাটা পরীকে নিয়ে কে না ঘুরে বেড়াতে চাইবে? অহনার আয়ত চোখে চোখ রাখলে কেমন মদিরতায় বুঁদ হয়ে যেতে হয়। ওর হাসি এখন পর্যন্ত সৈকত দেখেনি, তবে ও হাসলে ধবল জ্যোস্নার

লাবণ্য ঝিলিক দিয়ে ওঠবে-এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়। ওর শরীর থেকে অদ্ভূত মিষ্টি একটা সুবাস চুইয়ে চুইয়ে বের হয়ে আসছে, এটা ব্র্যান্ডেট কোন পারফিউমের সৌরভ নয়। কোন কোন মেয়েদের শরীর থেকে মিষ্টি গন্ধের ঐশ্বরিক সুবাস বের হয়ে আসে। অহনার শরীর থেকেও এ ধরনের সুবাস পাচ্ছে সৈকত। ওর সঙ্গে ঘুরলে এই সুবাসের নির্যাস পাওয়া যাবে। মাত্র কয়েক মুহূর্তে অহনাকে নিয়ে ভাবনায় তলিয়ে যাচ্ছিলো সৈকত। সুমনের কথায় সম্বিত ফিরে পায় ও।

'কীরে, অমন হা হয়ে গেলি যে! কিছু বলছিস না কেন?'

নিজেকে সামলে নিয়ে একটু লজ্জিত গলায় সৈকত বললো,

'না, আমি ভাবছিলাম, অহনা আমার সঙ্গে ঘুরলে তার আবার অসুবিধা হয় কিনা! সিডনীর পরিবেশ এক, আর ঢাকার পরিবেশ আরেক। তাইনা?'

অহনা হেসে বললো,

'আমি এ দেশেরই মেয়ে। আমার কোন অসুবিধা হবে না।'

সৈকত অহনার দিকে চেয়ে বললো,

'ঠিক আছে, আপনি আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারেন। তবে সব সময় নয়। আমার যখন সময় হবে, আমি আপনাকে নিয়ে ঘুরবো, কেমন?'

তবে ও মনে মনে বললো 'তুমি সারাক্ষণ আমার পাশে থাকলে ভালোই লাগবে।'

অহনা সৈকতের দিকে চেয়ে বললো,

'নো-প্রবলেম।'

এ সময় সুমন বললো,

'তাহলে কথা ফাইনাল। তোর কাজ দুটি। রাতুল নামের ছেলেটিকে খুঁজে বের করা এবং অহনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। আগামী দু' সপ্তাহের জন্য তুই বুক্‌ড। বুঝলি?'

সৈকত অহনার চোখে চোখ রেখে বললো,

'আপনি আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবেন, বিষয়টি ভাবতে ভালো লাগছে না আমার।'

অহনা খানিকটা হচকিয়ে গেল। ও বললো,

'কেন? আমি কী সঙ্গী হিসাবে খুব খারাপ হবো বলে ভাবছেন আপনি?'

এর জবাবে সৈকত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। সুমন ওকে কিছু বলতে না দিয়ে বললো,

'তোর ভালো না লাগলেও অহনাকে নিয়ে তোকে ঘুরতে হবে। আমার কাজিন তোর পাশে থাকলে তোর মান বাড়বে বৈ কমবে না, বুঝলি!'

এ কথায় না হেসে পারলো না সৈকত। অহনা একটু লজ্জা পেল। ও বললো,

'আপনি কাজটির কথাই ভাবুন। আমি আপনাকে খুব একটা বিরক্ত করবো না।'

'না, না, বিরক্ত হবো কেন? আসলে আমি ছন্নছাড়া মানুষ। কখন কোথায় থাকি, নিজেই জানি না। তাই --!'

'তোকে এতো কৈফিয়ত দিতে হবে না। তোকে যা বলেছি, তাই করবি। বন্ধু হিসাবে এটা বিশেষ অনুরোধ।'

সৈকত কোন কথা বললো না। এরপর আর কিছু বলা যায় না। তাছাড়া সুমন ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনুরোধ না রাখার মতো ওদের বন্ধুত্ব নয়। সৈকত মনে মনে বললো, 'কেয়া, কয়েকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়তো হবে না। একটা পরীর সঙ্গে আমি ঢাকা শহরের অলি-গলি ঘুরে বেড়াবো। কী দারুন মজা!'

দুই

পুরানো ঢাকায় সহজে কেউ আসতে চায় না। সরু রাস্তা এবং দীর্ঘ যানজট পুরানো ঢাকার বিড়ম্বনা। এই বিড়ম্বনায় কেউ পড়তে চায়না। তবে যারা পুরানো ঢাকায় বসবাস এবং ব্যবসা করছেন তাদের কাছে এখানকার যানজটের বিড়ম্বনা সহে গেছে। তারা সরু অলি-গলিতে যানবাহনে দিব্যি আসা-যাওয়া করছেন। সৈকত ভেবেছিল অহনা পুরানো ঢাকার যানজটের বিড়ম্বনায় বিরক্ত হবে। কিন্তু দেখা গেল অহনা মোটেই বিরক্ত হলো না। বরং কেমন কৌতুহলী হয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে। ওরা রিকশায় চড়ে লালাবাগের দিকে যাচ্ছে। অহনার পাশে বসে সৈকতের মনের মধ্যে একটা মিহিন তোলপাড় চলছে। অহনাকে সুমনের অফিসে প্রথম যখন দেখেছিল ও, তখন ও পড়েছিল জিন্স প্যান্ট এবং টি শার্ট। আজ অহনা পড়েছে সালোয়ার-কামিজ। সালেয়ার কামিজের ওপর মেরুণ রঙের ওলের স্যুয়েটার পড়েছে। অক্টোবর মাস। শীতের মধ্য দুপুর। বাতাসে হালকা শৈত্য প্রবাহ থাকলেও সূর্য ছড়াচ্ছে প্রখর কিরণ। আজকের দুপুরকে 'রোমান্টিক দপুর' বলে দেয়া যায়। মনে মনে এ কথা ভাবলো সৈকত। যদিও অহনার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। তবু ওর মনে হচ্ছে এই শীতার্ত আলোকিত দুপুর ওদের মধ্যে অদৃশ্য কোন সম্পর্ক তৈরি করে দিতে পারে। রিমঝিম বৃষ্টির দুপুর ছাড়াও হিমশীতের রোদ্রোজ্জ্বল দুপুরও কাব্যিক হতে পারে। অকারণ আবেগের এক পশলা উচ্ছ্বলতায় সৈকত ওর পাশে বসে থাকা অহনার দিকে তাকালো। অহনা আজ ঠোঁটে লিপিষ্টিকের প্রলেপ ও কপালে দিয়েছে টিপ। ওর মনে হলো, অহনা'র মধ্যে অন্যরকম সৌন্দর্য ফুটে আছে। প্রথম দেখার দিন জিন্স-প্যান্ট পড়ে থাকা অহনাকে ডানাকাটা পরী মনে হয়েছিল সৈকতের। এখন ওকে মনে হচ্ছে অপ্সরী। ওর আয়ত চোখ, টিকালো নাক, মুখের মায়াবী হাসি, রিনরিনে মিষ্টি কণ্ঠ এবং উচ্চতা ও আকর্ষণীয় ফিগার যে কোন বিচারে ওকে পৃথিবীর 'শ্রেষ্ঠ সুন্দরী' বলা যায়। তবে ওর চুল দীঘল না হয়ে কেন যে ববকাট ছাট, এর জন্য সৈকতের খানিকতা অস্বস্থি রয়েছে। যদিও ওকে ববকাট চুলে খারাপ লাগছে না। অহনা যখন রিকশায় ওর পাশে বসেছিল অদ্ভূত একটা মিষ্টি গন্ধ ওকে মাতাল করে তোলে। কেয়ার পাশে বসলেও সৈকত মিষ্টি একটা গন্ধ টের পায়। সব সুন্দরী মেয়েদের শরীর থেকে এমন মিষ্টি সুবাস বের হয়ে আসে। এক ধরনের আবিষ্টতায় ও ডুবে যাচ্ছিলো। অহনার প্রশ্নে আবিষ্টতা ভাঙে।

'শুনেছি লালাবাগে একটি কেল্লা রয়েছে। এটি নাকি হিস্ট্রিক্যাল প্লেজ?'

'ঠিকই শুনেছেন। এর নাম লালবাগ কেল্লা।'

বললো সৈকত। অহনা সৈকতের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কৌতুহলী গলায় বললো,
‘এই কেল্লায় কী হতো?’
এর জবাবে সৈকত বলতে যাচ্ছিলো যে, ‘এই কেল্লা ঈশা খাঁ তৈরি করেছিল যুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত দুর্গ হিসাবে। এটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।’
সৈকত এ কথা না বলে রসিকতা করে বললো,
‘এখানে ঈশা খাঁ নামক এক রাজা প্রেম করতেন। এটি ঈশা খাঁ’র প্রেমকুঞ্জ। এই কেল্লায় তার প্রেমিকা থাকতেন। ঈশা খাঁ’র প্রেমিকা ছিল তৎকালীন সময়ের ডাকসাইটে বাঈজী। এই কেল্লায় জলসা বসতো। একদিন জমকালো এক জলসায় প্রেমিকার দেয়া মদের গ্লাসে বিষ পান করে ঈশা খাঁ মারা যান!’
সৈকতের কথায় রিনরিনিয়ে হেসে ওঠলো অহনা। সৈকত ওর দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকালো। অহনার হাসি ধবল জ্যোস্নার মতই লাবণ্যময়! সৈকত তন্ময় হয়ে যাচ্ছিলো। অহনা হাসি থামিয়ে বললো,
‘হিষ্ট্রিতে আপনার নলেজ ভীষণ পুওর!’
‘তাই নাকি? হবে হয়তো।’
নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করলো ও।
অহনা হাসির রেশ নিয়ে সৈকতের দিকে তাকিয়ে বললো,
‘আমাকে কেল্লায় নিয়ে যাবেন?’
কথাটি এমন বিনয় মিশ্রিত অনুরোধে বললো, যেন ওকে স্বর্গলোকে নিয়ে যাবার বিশেষ অনুরোধ করছে। সৈকতের ভালো লাগলো। ও অহনার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো,
‘আপনি যেখানে যেখানে যেতে চান, আমি সেখানে নিয়ে যাবো।’
‘সত্যি!’
‘সত্যি।’
‘তবে সবার আগে রাতুলকে খুঁজে বের করতে হবে। ওকে খুঁজে বের করতে পারবেন না?’
‘চেষ্টা করে দেখি। আশা করি পারবো। একটা প্রশ্ন করবো?’
‘করুন।’
‘কিছু মনে করবেন না তো?’
‘না, কিছু মনে করবো না। আমি বুঝতে পারছি, আপনি কী প্রশ্ন করবেন। আপনি জানতে চাচ্ছেন রাতুল কে এবং কেন তাকে খুঁজছি, তাইনা?’
‘হুম্। এই কৌতুহল প্রথমে ছিল না। এখন জানতে ইচ্ছে করছে রাতুল কে এবং কেন তাকে খুঁজছেন।’
অহনা সৈকতের দিকে তাকিয়ে আবারো মিষ্টি করে হাসলো। ওর এই হাসিতে সৈকত নিজের ভেতরে একটা ভাঙন টের পেল। মিহিন তোলপাড় এবং ভাঙন কেন হচ্ছে, কে জানে! অহনা ধাঁ ধাঁ দেয়ার মত করে বললো,
‘আপনি গেইস করুন তো। আই মীন, বলুন তো রাতুলকে কেন খুঁজছি?’

সৈকত এবার একটু চিন্তায় পড়ে গেল। রাতুলকে অহনা চেনে না। ওকে কখনো দেখেনি। নাম পরিচয়ও জানে না। যদি রাতুলকে চিনতো বা জানতো, তবে ধরে নেয়া যেত ওদের মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। রাতুল কোন কারণে দেশে ফিরে এসেছে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় আর ফিরে যায়নি। তাই অহনা ওর সন্ধানে বাংলাদেশে এসেছে। এ রকম কিছু নয়। তবে? রাতুলকে খুঁজে বের করার সঠিক কারণ কী হতে পারে, তা নির্ণয় করা যায় না। তবু ধারনা করে সৈকত বললো,

'এই ছেলেটি হয় কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চলে এসেছে বা আপনার অথবা আপনাদের কোন বড় ধরনের ক্ষতি করেছে। কিংবা তাকে আপনাদের ভীষণ প্রয়োজন। এই জন্য আপনি বা আপনারা ওকে খুঁজছেন।'

সৈকতের জবাবে ভীষণ খুশি হলো অহনা। ও বললো,

'আপনার আই কিউ ভীষণ ভালো। আপনাকে দিয়ে হবে।'

'কী হবে?'

'রাতুলকে খুঁজে বের করার কাজটি হবে।'

'ধন্যবাদ। তাহলে আমার ধারনা ঠিক আছে?'

'অনেকটা কাছাকাছি আছেন।'

'আমাকে কি নেপথ্য কারণটা বলবেন?'

এর জবাবে কিছু বললো না অহনা। ও চুপ হয়ে গেল। ওর হঠাৎ চুপসে যাওয়ায় সৈকত একটু বিব্রত হলো। ও বললো,

'ঠিক আছে, বলতে হবে না। খুব গোপনীয় কিছু হলে না বলাই ভালো। আমাকে গোপনীয় কিছু বলতে পারেন, এমন সম্পর্ক আমাদের নয়। আই এ্যাম সরি।'

অহনা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো,

'এখন কেন জানি মনে হচ্ছে, আপনার কাছে ঘটনাটা খুলে বলা দরকার। আমাদের কষ্টের সঙ্গে আপনার সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। হয়তো এতে আমাদের লাভ হবে।'

অহনার কথাগুলো সৈকতের মনে রেখাপাত করে গেল। ও কিছু বললো না। অহনা ফের বললো,

'আপনি কী শুনতে চান আমাদের কষ্টের কথা?'

অহনার কণ্ঠে বিষণ্নতার মেঘ। এই বিষণ্নতা ছুঁয়ে গেল সৈকতের হৃদয়। ও বললো,

'ভাড়াটে অনুসন্ধানকারীর কাছে কষ্টের কথা বলবেন? আপনার কষ্টের কথা শুনতে হলে আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরী হওয়া দরকার।'

এ কথায় কেমন চোখে সৈকতের দিকে তাকালো অহনা। সৈকতের ভেতরে আরো একবার ভাঙন হলো। ও নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,

'যদি বন্ধু ভাবতে পারেন, তাহলে কষ্টের কথাটি বলুন। নইলে নয়।'

এ কথা বলে সৈকত যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। ও আলোচনাকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গেছে। এখন অহনার পালা। অহনার জবাব আশা করছে ও। ওর মনে হচ্ছিলো অহনা এর

কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকবে এবং বাকীটা পথ এক ধরনের গুমোট অস্বস্থিতে ছটফট করতে হবে ওকে। কিন্তু অহনা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,

'আপনাকে বন্ধু ভাবতে চাই না। বন্ধু বলেই জানতে চাই। আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম, কেমন?'

অহনার এ কথায় সৈকতের মন থেকে অস্বস্থির মেঘ মিলিয়ে গেল। ওর ভেতরের তোলপাড়টাও থেমে গেল। অন্য ধরনের অনুভূতি টের পেল ও। সৈকত অহনার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো,

'আপনার বন্ধু হতে পেরে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি!'

সৈকতের এ কথায় ভীষণ লজ্জা পেল অহনা। ও বললো,

'আমাকে এতো বেশি মর্যাদা দিয়ে লজ্জিত করবেন না, প্লিজ! বিশেষ করে আজকের পর থেকে।'

এর জবাবে হাসলো সৈকত। ও বললো,

'কথাটি মনে থাকবে। এবার বলুন তো রাতুল কে?'

কয়েক মুহুর্ত চুপ থেকে অহনা বললো,

'আমার ছোট এক বোন আছে। ওর নাম রায়না। রায়না আমার দেড় বছরের ছোট। আমরা দুই বোন বড় হয়েছি বন্ধুর মত। স্বভাবের দিক থেকে রায়না একটু চটপটে। উচ্ছল। ও ভীষণ প্রাণবন্ত একটি মেয়ে। রায়নার সঙ্গে রাতুলের পরিচয় হয় ইন্টারনেটে চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে। পরিচয় থেকে প্রেম। প্রেম থেকে প্রণয়। আমরা এর কিছুই জানতে বা বুঝতে পারিনি। যখন জানতে পারলাম, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।'

এ পর্যন্ত বলে অহনা থামলো। কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শুনছিল সৈকত। ও প্রশ্ন করলো,

'অনেক দেরী হয়ে গেছে মানে? রায়নার কিছু হয়েছে?'

'রাতুল হঠাৎ করে অষ্ট্রেলিয়া থেকে চলে এসেছে বাংলাদেশে। রায়নার সঙ্গে রাতুল যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর থেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে রায়না।'

'ও, আচ্ছা!'

'এখানেই শেষ নেই। সবচেয়ে ভয়ংকর কথা হচ্ছে, রায়না প্র্যাগন্যান্ট!'

এ কথা চমকে গেল সৈকত। অহনাদের সংকট কতটা গভীরে বুঝতে পারলো এ কথায়। ও কোন কথা বলতে পারলো না। এ ধরনের কথার জবাবে কী বলা যায়-সৈকত বুঝতে পারছে না। ওর মনে হলো, রাতুলকে খুঁজে বের করতেই হবে। রাতুলকে পৌঁছে দিতে হবে রায়নার কাছে। যেভাবেই হোক, কাজটি ওকে করতে হবে। সৈকতের মনে একটা জেদ পেখম ছড়াতে থাকে। অহনা নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,

'আমি চাচ্ছি, রাতুলকে রায়নার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। রায়না ভীষণ ভেঙে পড়েছে। ও আমার ঠিক উল্টো। অনেক সফট ওর মন। ভীষণ আবেগপ্রবণ ও। রাতুলকে না পেলে ও হয়তো কিছু একটা করে ফেলবে।'

'রাতুলকে খুঁজতে আপনি কেন বাংলাদেশে এলেন? আপনার বাবাও তো আসতে পারতেন।'

বললো সৈকত। অহনা অন্যদিকে তাকিয়ে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
‘বাবা অসুস্থ। তার তিনটি স্ট্রোক হয়ে গেছে। আমরা চাইনা তিনি কোন দুঃসংবাদ শুনুক।’
‘আমি বুঝতে পেরেছি। আমি দুঃখিত।’
‘না, না। আপনার দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমাকে শুধু রাতুলকে খুঁজে বের দিন।’
‘আচ্ছা, রাতুল যদি এখন রায়নাকে অস্বীকার করে? অর্থাৎ রায়নার সন্তানের দায়িত্ব নিতে না চায়?’
প্রশ্নটি করেই সৈকতের মনে হলো এ ধরনের প্রশ্ন করা ওর ঠিক হয়নি। অহনার মনের এই অবস্থায় এই প্রশ্ন ভীষণ বিব্রতকর। প্রশ্নটি করে ও অস্বস্থিতে পড়ে গেল। অহনা একটু চুপ থেকে বললো,
‘এ রকমন যেন না হয়। আর যদি হয়, তবে চেষ্টা করবো রায়নাকে এব্রোশন করাতে। ও সব কথা ভাবতে চাই না সৈকত!’
অহনার মুখ থেকে এই প্রথম সৈকত ওর নিজের নাম শুনলো। ওর ভেতরে ভাঙচুর শুরু হলো। একরাশ বিষণ্নতা এবং এক তাল আনন্দ ঢেউ তুলে আছড়ে পড়ছে ওর সমস্ত চেতনায়। রিকশা চলছে একটু দুলে দুলে। অহনার শরীরটাও দুলছে। ওর শরীরে বিদ্যুত চমকাচ্ছে। তন্ময়তায় সৈকতের মনে হচ্ছিলো অহনার হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলতে, ‘আমার নামটি আরেকবার বলো তো!’
সব কথা সব সময় বলা যায় না। তবে কল্পনার কোন সীমারেখা নেই। কল্পনায় কোন বাধা নেই, বিধি নেই। সৈকত ডুবে গেল কল্পনার গভীর অতলে।

তিনি

সৈকতের মধ্যে এক ধরনের সরলতা আছে। এই সরলতার কারণে কখনো কখনো সৈকতকে বোকা মনে হয়, কিন্তু গভীরভাবে ভাবলে ওর এই সরলতার এক নান্দনিক মাত্রা বের হয়ে আসে। ওর চরিত্রকে যদি আকাশ ধরা হয়, তবে ওর সরলতা হচ্ছে আকাশের ধ্রুবতারা। সৈকতের আরো অনেক গুণ আছে। যেমন সৈকত চমৎকার পেন্সিল স্কেচ করতে পারে। গলা ছেড়ে গান গাইতে পারে। ও কখনো গান না শিখলেও গলাটা ওর মন্দ নয়। ওর মধ্যে নির্লোভ এক সত্ত্বাও রয়েছে। ওর এই গুণগুলো কেয়া আগে জানতে পারেনি। এখন সৈকতের এই গুণগুলো জানতে পারছে। অথচ সৈকতকে বোকা ও ভবঘুরে ভেবে কেয়া ওকে বিয়ে করেনি। ও বিয়ে করেছে শ্যামলকে। অনেক হিসাব করেই কেয়া বিয়ে করেছে বিত্তবান ব্যবসায়ী শ্যামলকে। কিন্তু সব সময় সব কিছু হিসাব মত হয় না। কখনো কখনো হিসাবের খাতায় গণেশ উল্টে যায়। বুমেরাং-ও হয়ে যায়। কেয়ারও হয়েছে তাই। শ্যামলকে বিয়ে করে বিত্তহীন স্বামী পেয়েছে ঠিক, কিন্তু সুখের সংসার গড়তে পারেনি। অথচ সৈকতকে বিয়ে করলে বিত্ত হয়তো পেত না, চিত্তের বিলাসিতায় মুখর হতে পারতো। ওকে বিয়ে না করার জন্য এখন আফসোস হয় ওর। জীবনের বড় ভুলটাকে শুধরে নিতে ইচ্ছে করে। আর এই ইচ্ছেটা দিনদিন বাড়ছে। শ্যামলকে ছেড়ে সৈকতকে আকড়ে ধরবে কিনা-মাঝেমাঝে

ভাবে ও। কিন্তু শ্যামলের ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করার সাহস ও পায়না। অথচ শ্যামল স্বামী হিসাবে ওর জীবনে ছায়ামাত্র, নির্ভাবনার বিশ্বস্থ অবলম্বন নয়। কেয়ার প্রতি শ্যামলের উপেক্ষা যেমন স্পষ্ট, তেমনি বিত্তশালীর সহজাত অহংকারও শ্যামলের আচার-আচারণে প্রকাশও বরাবরই স্পষ্ট। এ ছাড়া শ্যামলের অন্য নারীতে আসক্তির বিষয়টিও গোপন নয়। বিত্তশালীরা নারীতে আসক্তি, মদ পান ও জুয়া খেলাকে সামাজিক কাজের মতই স্বাভাবিক মনে করেন এবং তারা এ ব্যাপারে আশ্চার্যজনকভাবে নিঃসঙ্কোচিত। ঐশ্বর্য বা প্রাচুর্যের পরিধিতে বিত্তবানদের স্ত্রীরা 'সব মেনে নেয়া'র বৃত্তে ঘুরাপক খান এবং তাদের কোনরকম হা-পিত্তেস করতে দেখা যায়না। ঐ সকল বিত্তশালীদের স্ত্রীদের সঙ্গে কেয়ারও খুব একটা অমিল নেই। এ নিয়ে কেয়ার কোন আফসোস বা আক্ষেপও নেই। কিন্তু কেয়ার সামনে সৈকতের নির্জলা প্রেমের দ্বিতীয় দফা সমর্পণ ওকে ভাবনায় ফেলে দেয়। ওর হিসাবের খাতায় জমাট বাঁধিয়ে দেয় আক্ষেপের মেঘ। বিয়ের চার বছর পর সৈকতের সঙ্গে ওর পুনরায় দেখা হবার পর থেকে কেয়া নিজের মধ্যে বৈভবের আড়ালে 'সুখী না হবার' গভীর বেদনার নম্রলাজ অন্য এক কেয়াকে আবিস্কার করে। এরপর থেকে ধীরে ধীরে সুখী না হবার অনুভূতিটা ওর মনের অন্তপুরে পেখম ছড়িয়ে যাচ্ছে। আগে সৈকতের সঙ্গে দেখা হলেই এই অনুভূতিটা চাঙা হতো। এখন সৈকতের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেও এই অনুভূতি জেগে ওঠে। জীবনটা কেন যে এমন হয়, তা ও জানে না! গুলশানে বুখারা রেষ্টুরেন্টে কেয়া বসে এ সব কথা ভাবছিল। প্রায় এক ঘন্টা যাবত ও এখানে বসে আছে। সৈকতর সঙ্গে ও লাঞ্চ করবে। ও মাঝেমাঝে সৈকতকে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানায়। সৈকতকে ও লাঞ্চের আমন্ত্রন জানিয়েছে। কেয়া বিভিন্ন রেষ্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে পছন্দ করে। কোন্ রেষ্টুরেন্টের খাবার কেমন স্বাদ পরখ করে নিতেও চায় ও। বুখারা রেষ্টুরেন্টে একঘন্টা যাবত একটি টেবিলে ও বসে আছে বিষয়টি বিব্রতকর। এরইমধ্যে ও খাবারের ম্যেনু দেখে বেয়ারাকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিয়ে রেখেছে। বেয়ারার হাতে অগ্রিম এক শ' টাকা টিপস দিয়ে বলেছে,

'আমার বন্ধু এলে খাবার সার্ভ করবেন,প্লিজ।'

বেয়ারা ভীষণ খুশি হয়ে যায়। টাকার একটা শক্তি আছে। টাকা দিয়ে যে কোন পরিবেশ নিজের অনুকূলে নিয়ে আসা যায়। 'ম্যাডাম, আপনি অপেক্ষা করুন। আপনার বন্ধু এলে আমি খাবার সার্ভ করবো' বলে বেয়ারা চলে যায়। কেয়া স্বস্থি ফিরে পায়। তারপরও একঘন্টা অপেক্ষা অনেক সময়। ও কখনো কারো জন্য এতো দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেনি। এই কথাটি ভাবতেই ওর নিজের অহংকারে মৃদু ধাক্কা লাগলো। সৈকত কি ওকে উপেক্ষা করছে? সুন্দরী নারীরা উপক্ষো একেবারেই সহ্য করতে পারে না। সৈকত ওকে উপেক্ষা করছে কিনা-এ কথা মনে হতেই ও দেখলো সৈকত এগিয়ে আসছে ওর টেবিলের দিকে। কেয়ার মনে অভিমান এবং রাগ সংমিশ্রিত হয়ে একরকম তেতো অনুভূতি সক্রিয় হয়ে ওঠলো। সৈকত অপরাধীর মত ওর সামনে এসে লজ্জিত গলায় বললো,

'আই এম সরি ফর টু লেট! আমি জানি, তুমি অনেকক্ষণ যাবত আমার জন্য অপেক্ষা করছো। আমি এক্সট্রেনলি সরি!'

এ কথা বলে ও বসলো কেয়ার মুখোমুখি। কেয়ার রাগ বাড়ছে। ও সৈকতের কথার জবাবে কিছু বললো না। এ সময় বেয়ারা এসে কেয়াকে জিজ্ঞেস করলো,

'ম্যাডাম, খাবার সার্ভ করবো?'

কেয়া কিছু বলার আগে সৈকত বেয়ারাকে বললো,

'একটু পর সার্ভ করুন,প্লিজ।'

বেয়ারা হেসে চলে গেল। সৈকত কাচুমাচ হয়ে ফের বললো,

'বিশ্বাস করো, একটা জরুরি কাজে আটকে গিয়েছিলাম। তারওপর রাস্তায় যানজট। আমারও অনেক অস্বস্থি হচ্ছিলো। তোমাকে আমি অনেকবার ফোন করলাম, তুমি ফোন ধরোনি।'

কেয়া ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো,

'দেরী হয়ে যাওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলতে, জানি। মিথ্যবাদীদের ফোন আমি কেন ধরবো?'

'আমি মিধ্যবাদী!'

'নয়তো কি?'

'কেন মিথ্যাবাদী বলছো?'

'তুমি মিথ্যাবাদী, তাই মিথ্যাবাদী বলছি!'

'কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলছি না, বিশ্বাস করো।'

'রাজনীতিবিদদের কেউ বিশ্বাস করে না!'

'তাই নাকি, কেন?'

'কারণ, তারা সব সময় মিথ্য কথা বলে। তারা মঞ্চে অকপটে মিথ্যা বলে হাজার হাজার মানুষের সামনে। তারা মানুষকে বোকা ভাবে। তারা কথার জাল বুনে নির্জলা মিথ্যার প্রতিশ্রুতি দেয়। অনেকরকম মিথ্যাই তারা আবেগ মিশ্রণ করে জনতার সামনে ছেড়ে দেয়। এ সব তো তুমি নিশ্চয়ই জানো, তাইনা?'

'আর?'

'আর হচ্ছে, রাজনীতিবিদদের এই মিথ্যা বলাটা পেশায় পরিণত হয়ে গেছে।'

'তাহলে রাজনীতিবিদদের মানুষ ভালোবাসে কেন? কেনই বা তাদের প্রতি সমর্থন জানায়, ভোট দেয়?'

'সাধারণ মানুষ মোহগ্রস্থ হয়ে ওই কাজ করে। কিংবা এর বিকল্প কিছু নেই বলেও মানুষ বাধ্য হয়ে তাদের সমর্থন জানায়। তাই বলে রাজনীতিবিদদের এ নিয়ে আত্মতৃপ্তিরও কিছু নেই। একসময় সাধারণ মানুষের মোহ কিন্তু ভেঙে যায়!'

'তুমি দেখছি, রাজনীতিবিদদের উপর ভীষণ খেপো আছো! সেটা কি আমার জন্য?'

এর জবাবে কিছু বললো না কেয়া। মৌনতার মধ্য দিয়ে এর 'হ্যাঁ' বোধক জবাব প্রকাশ করলো ও। সৈকত পরিবেশকে সহজ করার জন্য হাসিমুখে বললো,

'আমি কিন্তু ছেলেবেলায় খুব মিথ্যা কথা বলতাম।'

'সেই বদ অভ্যাসতো এখনো যায়নি।'

'পুরোপুরি যায়নি, ঠিক। তাই বলে সব সময় ঢালাওভাবে মিথ্যা আমি বলি না।'

'কখোন, কোন কোন সময় মিথ্যা বলো? কখোন ঢালাওভাবে মিথ্যা বলো? আবার কখোন সামান্য এবং হালকা-পাতলা মিথ্যা বলো, শুনি?'

'আজকাল আমি খুব একটা মিথ্যা কথা বলি না বা বলতে হয়না।'

'আহা! কী সাধু পুরুষ আমার!'

কপালে ভ্রু নাচিয়ে ফোড়ণ কাটলো কেয়া। সৈকত ওর মিষ্টি অনুযোগকে উপভোগ করে বললো,

'আমি সাধু পুরুষ বটে, তবে তোমার হলাম কবে?'

এ কথায় কেয়া খিলখিল করে হেসে ওঠলো। অভিমানের জমাট মেঘ মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে হাঁফ ছাড়লো সৈকত। ওর হাসির দমকায় সৈকত সপ্রতিভ হতে লাগলো। কেয়া হাসি থামিয়ে বললো,

'তুমি যে আমার নও, তা জানি। কিন্তু মানতে পারিনা। মনে হয়, তুমি শুধু আমার।'

'অথচ তুমি এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী শ্যামলের।'

বললো সৈকত। কথাটি বলার সময় এক টুকরো দীর্ঘশ্বাস ছাপিয়ে ওঠেছিল, তা সামলে নিল ও। কেয়া ভাবাবেগের মধ্যে বললো,

'আসলে কী, জানো, শ্যামল যেমনি আমার, তুমিও একরকম আমারই। শ্যামল আমার হাজব্যান্ড, মানে আশ্রয়। আর তুমি হচ্ছে আমার প্রেমিক, মানে স্বপ্নের অবলম্বন!'

এ কথায় না হেসে পারলো না সৈকত। কেয়া সৈকতের হাসিকে উপেক্ষা করে বললো,

'আচ্ছা অনেক পুরুষ মানুষের যদি একের অধিক স্ত্রী থাকতে পারে, নারীদের কেন একাধিক স্বামী থাকতে পারে না?'

কেয়ার এই প্রশ্নে সৈকত নিশ্চিত হলো, ওর মধ্যে রাগটা উবে গিয়ে এক ধরনের দার্শনিক ভাব জমে যাচ্ছে। সৈকত এই ভাবকে চাঙা করতে সিরিয়াস কণ্ঠে বললো,

'প্রকৃতগতভাবে নারী ভোগবাদীর চেয়ে সমপর্ণকামী। নারী সমর্পণের মধ্য দিয়ে জয়ের আনন্দ পায়। বিগলিত হয়। নারী ভালোবাসা পাবার চেয়ে ভলোবেসে জীবনের মহিমা খোঁজে। এখানেই নারীর মহত্ব।'

'আর পুরুষ?'

'সাধারণত পুরুষ ভোগবাদী এবং দখলকামী। কখনো কখনো কপটও। ভোগ এবং দখলের মধ্য দিয়ে পুরুষ যেমন আনন্দ পায়, তেমনি অর্জন করে এক ধরনের অহংকারও। পুরুষ জীবনের মহিমার চেয়ে প্রাপ্তির অহংকারটাই বড় করে দেখে। তাই পুরুষের মধ্যে স্যাক্রিফাইস মানসিকতার প্রবণতা কম। পুরুষ সাম্রাজ্য ও সম্রাজ্ঞি দুটোর পাশাপাশি আরো

অনেক কিছু চায়। কিন্তু নারীর চাহিদা নির্দিষ্ট গন্তব্যে এলে তারা আত্মতৃপ্তির বৃত্তে বাধা পড়ে যায়। কিংবা চাহিদা পুরণ না হলেও নারী আগ্রাসী হতে পারে না, কিন্তু পুরুষ বরাবরই আগ্রাসী!'

'চমৎকার!'

'কী?'

'তোমার বিশ্লেষণ! বিভিন্ন জনসভায় কি এ সব কথা বলো ?'

কেয়ার কথায় মুচকি হাসলো সৈকত। বললো,

'এসব কথা মঞ্চে বললে পুরুষরা আমাকে আর আস্ত রাখবে না। মেয়েরাও পুরুষের বিরুদ্ধে খুব বাজে কথা শুনতে পছন্দ করেনা, জানো?'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। অন্তত আমার তাই মনে হয়।'

'কেন, নারীরা খুশি হবে না কেন?'

'ঐ যে বললাম না, নারীরা সমপর্ণকামী। তা নারীরা কার কাছে সমর্পিত হয়, পুরুষের কাছেই তো? যার কাছে সমর্পিত হবে, তার বিরুদ্ধে কথা শুনতে কি নারীদের ভালো লাগবে, বলো?'

কেয়া কিছুক্ষণ বিহবল হয়ে তাকিয়ে রইলো সৈকতের দিকে। সৈকত কেয়ার মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। কেয়ার রাগ থামিয়ে দিতে পেরে ও মনে মনে খুশি। কেয়ার বিহবলতা কাটিয়ে দিতে সৈকত বললো,

'তা তোমার দু'টো স্বামী কেন দরকার?'

এ কথায় এক ধরনের ভাবনা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলো কেয়া। ও কয়েক মুহুর্ত পর সৈকতের চোখে চোখ রেখে বললো,

'চাহিদা পুরণের আত্মতৃপ্তি, সমপর্ণের আনন্দ কিংবা জীবনের মহিমা খোঁজার জন্য আমার দু'টো স্বামীর প্রয়োজন নেই। কথাটি বললাম জাষ্ট কৌতুহল বশতঃ। তবে এটাও সত্যি তোমাকে বিয়ে করিনি বলে আমার ভীষণ আফসোস হয়। মাঝেমাঝে মনে হয়, তোমার কাছেই এসে আশ্রয় নিই। কিন্তু..!'

'কিন্তু কি?'

'এই 'কিন্তু'র জবাব খুব সহজ। বিত্তশালী স্বামীর ভৈববের মধ্যে যে যাপনে অভ্যস্থ হয়ে গেছি, এর নাগপাশ থেকে বের হওয়া কি সহজ?'

'সত্যিই কি সহজ নয়?'

'আবেগে বের হওয়া যায়, কিন্তু যুক্তির সামনে এই আবেগ ভীষণ ম্রিয়মান!'

'কিন্তু কেন জানি মনে হয়, তুমি একদিন আমার কাছে ঠিক-ই চলে আসবে।'

এ কথা অনেকটা জোর দিয়েই বললো সৈকত। কেয়া একটু তন্ময় হলো। ও চোখের দৃষ্টিতে মাদকতা ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'যদি তোমার কাছে চলে আসি, সেদিন ফিরিয়ে দেবে আমাকে?'

এর জবাব দিল না সৈকত। ওর খুব খিদে পেয়েছে। ও বললো,
'আমার খুব খিদে পেয়েছে। বেয়ারাকে বলো, খাবার দিতে। খালি পেটে প্রেমালাপ হয় না।'
সৈকতের কথা কেয়া শুনলো কিনা, বোঝা গেল না। ও তাকিয়ে রয়েছে সৈকতের দিকে। যেন প্রশ্নটার জবাব ওর এখন চাই। সৈকত একটু অস্বস্থি নিয়ে তাকালো বেয়ারার দিকে। ও হাতের ইশারায় ডাকলো বেয়ারাকে। বেয়ারা চলে এলো। সৈকত কিছু বলার আগে কেয়া বেয়ারার উদ্দেশ্যে বললো,
'আমাদের তাড়াতাড়ি খাবার সার্ভ করুন, প্লিজ।'
'ঠিক আছে, ম্যাডাম। এখুনি দিচ্ছি।'
এ কথা বলে বেয়ারা চলে গেল। হাফ ছেড়ে বাঁচলো সৈকত। ও বললো,
'তুমি কেন আমাকে এখানে ডেকেছো, তা কিন্তু এখনো বলোনি, কেয়া!'
সৈকতের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠলো। কেয়া হালকা গলায় বললো,
'আগে খেয়ে নাও। খাবার পর আমাকে বলবে, অহনা মেয়েটি কে?'
কেয়ার মুখে 'অহনা'র নাম শোনামাত্রই চমকে গেল সৈকত। ওর শিরা-উপশিরায় যেন ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। অথচ এমন হবার কথা নয়। ও হচকিয়ে তাকালো কেয়ার চোখে। কেয়া সৈকতের লাজুক ও ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে বিলিয়ে দিল রহস্যময় হাসি। এই হাসির অর্থ দাঁড়ায় 'তোমার সবকিছুর খোঁজ আমি রাখি!'

চার

শফিকুর রহমান চাকুরী করতেন পরিসংখ্যান ব্যুরোতে। সিনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি লাভ করে গত দুই বছর হলো রিটায়র্ড করেছেন। চাকুরী জীবন নিয়ে তিনি কখনো সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরিসংখ্যান ব্যুরোতে উপরি আয় তেমন ছিল না। সংসারও চালাতেন টেনে-টুনে। স্ত্রী রাহেলা সংসারটাকে চালিয়ে নিয়েছে এবং এখনো নিচ্ছে। সংসারে সব সময় অভাব অনটন লেগেই থাকতো। এখন অভাব নেই বললেই চলে। বড় ছেলে জীবন ঠিকাদারীর ব্যবসা করছে। ও যথেষ্ট আয় করছে। জীবনের উপার্জন বলা যায় ঈর্ষণীয়। ঠিকাদারী ব্যবসাটা অনেক বছর যাবতই বেশ রমরমা। তবে এই ব্যবসায় ঝুঁকি আছে।
মাস্তানী-চাঁদাবাজি হয় এবং কখনো কখনো খুন-খারাবী হচ্ছে। এ সব নিয়ে ভয় পেলে তো হবে না। অভাবের সঙ্গে অসহায়ভাবে যুদ্ধ করার চেয়ে সাহস নিয়ে মাস্তান মোকাবেলা করে ঠিকাদারী ব্যবসা করা অনেক ভালো। অন্তত তাই মনে করেন শফিকুর রহমান। বড় ছেলে জীবনের ঠিকাদারী ব্যবসাকে তিনি ভীষণ পছন্দ করেন। তিনি গত তিরিশ বছর যাবত অনেক চেষ্টা করেও সংসারের অভাব দূর করতে পারেননি। কিন্তু জীবন গত তিন বছরে আমূল বদলে দিয়েছে সংসারের চেহরা। এ কথা ভাবলে তার মনটা আনন্দে ভরে যায়। আগে তিনি কখনো খবরের কাগজ কিনে পড়তে পারেননি। পাড়ার মোড়ে দেয়ালে লাগিয়ে দেয়া পত্রিকায় চোখ বুলাতেন। অফিসে লাঞ্চ আওয়ারে তড়িঘড়ি করেও খবরের কাগজ

পড়তেন। এতে তার তৃষ্ণা মিটতো না। চট-জলদি করে খবরের কাগজ পড়ায় চার্ম নেই। খবরের কাগজ পড়তে হয় ধীরে, খোশ মেজাজে এবং মনযোগ সহকারে। আগে আয়েশ করে খবরের কাগজ পড়তে পারেননি তিনি। এখন বাড়িতে নিয়মিত দু'টো সংবাদপত্র রাখা হচ্ছে। তিনি আরাম আয়েশ করে এবং আপন মনে খানিকটা গর্ব অনুভব করে তিনি প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়েন। এর মধ্য দিয়ে তিনি রিটায়ার্ড লাইফের একটি চমৎকার ভূবন তৈরি করতে পেরেছেন। গত তিরিশ বছর ধরে শফিকুর রহমানের অনেক দুঃখ ছিল। অনেক আক্ষেপ ছিল। না পাওয়ার অনেক হতাশা ছিল। এখন ও সব নেই। সবকিছু মিলিয়ে গেছে। শেষ বয়সে এসে স্বচ্ছল জীবন-যাপন তার এতোদিনের অপ্রাপ্তির হাহাকার মিইয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিন তিনি নিজেকে অসুখী ভাবলেও এখন তিনি নিজেকে একজন সুখী মানুষ ভাবেন। কিংবা নিজেকে সুখী মানুষ ভাবতে তার ভালো লাগে। শফিকুর রহমানের তিন ছেলে-মেয়ে। তার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে জীবন প্রথম, সৈকত দ্বিতীয় এবং সোমা তৃতীয়। এই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তার ভীষণরকম উচ্চাশা ছিল। তার তিনটি সন্তানই ছিল ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও পিতার উচ্চাশা পূরণ করতে পারেনি তারা। তিনজনের কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেনি বা তারা তা হতে চায়নি। অথচ তারা তা হতে পারতো। জীবন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চান্স পেয়েও ভর্তি হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার্স করেছে অর্থনীতিতে। ও মাষ্টার্স পাশ করেই নেমে পড়ে ঠিকাদারী ব্যবসায়। সৈকত ভর্তি হতে পারতো বুয়েতে। ও সে চেষ্টাই করেনি। লেখাপড়া করেছে ফার্মাসিতে। মাষ্টার্স পাশ করার পরপরই ও স্কালরশীপ পেয়েছিল ফান্সের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ও যায়নি। ফার্মাসির ছাত্র জড়িয়ে পড়লো রাজনীতিতে। রাজনীতি ওর মাথাটা খেয়ে ফেলেছে। মেয়ে সোমা অনার্স পড়ার সময়ই প্রেম করে বিয়ে করে ফেললো। কোনরকম অনার্সটা সম্পন্ন করেছিল ও। বড় ছেলে জীবনও বিয়ে করেছে প্রেম করে। ঠিকাদারী ব্যবসা সবে মাত্র শুরু করেছে, একদিন বউ এনে তুললো বাড়িতে। প্রথম প্রথম শফিকুর রহমানের আক্ষেপ ছিল বড় ছেলে এবং মেয়ের বিয়েতে তিনি কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি বলে। এখন এই আক্ষেপটা তেমন নেই। ছেলের বউ লাইজু ভীষণ ভালো মেয়ে। শ্বাশুড়ির সঙ্গে সে ভালোভাবেই সংসার সামলাচ্ছে। সোমাও ভালো আছে ব্যবসায়ী স্বামীকে নিয়ে। সোমার বিয়েটা সংসারের কেউ সহজভাবে নেয়নি বলে ও আসে না বাবার বাড়িতে। বিশেষ করে জীবন সোমার বিয়ের ঘটনাকে একেবারেই মেনে নেয়নি। ও সোমার ওপর রেগে আছে। অথচ ও নিজেও প্রেম করে বিয়ে করেছে। জীবনের রাগ না কমলে সোমার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে না-এটা মেনে নিয়েছেন শফিকুর রহমান। কারণ সংসার চলছে জীবনের উপার্জনে। ওর মতামতের একটা গুরুত্ব আছে। শফিকুর রহমানের মনটা মাঝেমাঝে মেয়ের জন্য ককিয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নেন। যে ছেলের উপার্জনে সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে, তার মনে আঘাত দেয়া যায় না, এটা কেউ না বললেও বুঝে নিতে হয়। তার ছোট ছেলে সৈকতের কোন প্রভাব নেই সংসারে। ও কেন যে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেল, এর অর্থ খুঁজে পাননা তিনি। এই ছেলের অন্ধকারাচ্ছন্ন

ভবিষ্যত নিয়ে উৎকণ্ঠিত তিনি। রাজনৈতিক নেতা হবার আকাশ কুসুম স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা সৈকত কার্যত বেকার এবং ভবঘুরে। রাজনীতির নামে ও এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিটিং-মিছিল করছে। মাঝেমাঝে পুলিশের হুলিয়া নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে ওকে। এ সব করে কী পায় ও ? দেশ ও জনগণকে কী দিয়েছে বিএনপি বা আওয়ামী লীগ? খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা কী এমন বদলে দিয়েছেন বাংলাদেশের চেহারা? স্বৈরাচারী সরকার এরশাদকে হটিয়ে এই দুই নেত্রী জাতিকে কী উপহার দিয়েছেন? তারাও দেশকে নিমজ্জিত করে দিয়েছেন সীমাহীন দুর্নীতির অতল গহবরে। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারী জরুরি অবস্থা জারি হবার পর থেকে এই দুই দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ঢালাও অভিযোগ প্রকাশ পায়। অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিতও হয়। খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা নিজেদের 'সৎ' বলে দাবি করলেও উভয়ই তা প্রমাণ করতে পারেননি। অথচ তাদের পেছনেই ছুটছে মোহগ্রস্থ লোকেরা। এ সব কথা ভাবলে শফিকুর রহমান বিস্ময়ে ডুবে যান। সৈকতের জন্য আফসোস হয় তার। সৈকতকে এ সব প্রশ্ন করলে ও বলে ওরা নাকি দেশটাকে বদলে দেবে! শফিকুর রহমানের ধারনা, মিথ্যা প্ররোচনায় রাজনীতির বলয়ে সৈকতের মত এক শ্রেণীর মানুষ মোহগ্রস্থ হয়ে একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। ছাত্ররা চরমভাবে বিঘ্নিত করছে শিক্ষা জীবন এবং তরুণরা নষ্ট করছে তাদের উদ্দীপ্ত সময়। তার আরো ধারনা, দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদদের মধ্যে আদর্শ বলতে কিছু নেই। তারা মুখে হরেক রকম মুখোশ পড়ে থাকেন। বাড়ির বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আজো এ সব কথা ভাবছিলেন শফিকুর রহমান। তিনি আজকাল অনেক কিছু ভাবেন। সন্তানদের কথা ভাবেন, প্রতিবেশির কথা ভাবেন, দেশের কথা ভাবেন। তার অখন্ড সময়। বাসার প্রবেশ মুখে বারান্দায় বসে তিনি ভাবছিলেন। তার ভাবনা ভেঙে দেয় অহনার প্রশ্ন।

'এক্সকিউজ মি! এখানে কী সৈকত থাকেন?'

শফিকুর রহমান একটু চমকে উঠলেন। সৈকতের কাছে অনেক লোক আসে ঠিক, কিন্তু কোন তরুণী এ পর্যন্ত আসেনি। সাধারণত সমস্যাগ্রস্থ লোকেরা ওর কাছে আসে। অহনার দিকে তাকিয়ে ভাবলো, এই মেয়েটিকে নিশ্চয় কোনো সমস্যা নিয়ে সৈকতের কাছে আসেনি। বিশেষ কোনো কারণে মেয়েটি সৈকতের কাছে এসেছে বলে শফিকুর রহমানের মনে হলো। অহনার দিকে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি। কয়েক মুহুর্ত অপেক্ষা করে অহনা আবার বললো,

'এখানে কি সৈকত থাকেন?'

'হ্যাঁ, থাকেন। আপনি কে?'

ভারী গলায় বললো শফিকুর রহমান। অহনা বললো,

'আমি অহনা। আমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

অহনার কথায় একটু অবাক হলেন শফিকুর রহমান। মেয়েটি এমন বিনয়ের সঙ্গে কথা বলছে যেন, সৈকত বিশেষ কোনো সম্মানিত লোক। শফিকুর রহমানের ভালো লাগলো।

রাজনীতিবিদদের যখন মূল্য কমে যাচ্ছে, সেখানে তার ছেলের প্রতি সম্মান প্রকাশ করে কথা বলছে মেয়েটি। 'এই মেয়েটি সৈকতকে নিশ্চয়ই খুব পছন্দ করে' এ কথা ভেবে শফিকুর রহমান পুলকিত হলেন। তিনি বললেন,
'দাঁড়াও মা, সৈকতকে ডেকে দিচ্ছি। না, না, তুমি বাসার ভেতরে চলে যাও। ও ভেতরেই আছে।'
'না, না। আমি ভেতরে যাবো না।'
'না, না, চলে যাও। ড্রইংরুমে গিয়ে বসো। আমার বড়ছেলের বউ লাইজুকে ডাকছি। ও ডেকে দেবে সৈকতকে।'
শফিকুর রহমান হাতের ইশারায় অহনাকে পথ দেখিয়ে দিলেন ভেতরে যাবার। অস্বস্থি নিয়ে সৈকতদের বাসায় প্রবেশ করলো অহনা। এরইমধ্যে বারান্দা থেকে গলা ছেড়ে শফিকুর রহমান তার বড়ছেলের বউকে ডাকলেন.
'বউমা, দেখো সৈকতের কাছে কে যেন এসেছে।'
বাসার ভেতর থেকে নারী কণ্ঠ ভেসে এলো,
'আসছি বাবা।'
কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেলেও কেউ এলো না। অহনা সৈকতদের ড্রইংরুমে ঢুকে একটু অস্বস্থি বোধ করতে লাগলো। ও যার বাড়িতেই যাবে ওর দৃষ্টি প্রথমে যাবে ঐ বাড়ির দেয়ালে। সাধারণত প্রত্যেক বাড়ির দেয়ালে ছবির ফ্রেম টানানো থাকে। অহনার দৃষ্টি সব সময় আটকে যায় ছবির ফ্রেমে। এখনো আটকে গেল সৈকতদের ড্রইয়ংরুমের দেয়ালে টানানো ছবির একটি ফ্রেমে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে সৈকত একজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবি দেখে মনে হচ্ছে ছবির লোকটি বিখ্যাত বা সম্মানিত কেউ হবেন। কিন্তু লোকটি কে অহনা জানে না। ও ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলো। এমন সময় ড্রইংরুমে এলো সৈকত। সৈকত বাসা থেকে বের হচ্ছিলো। ড্রইংরুমে অহনাকে দেখে ভীষণ অবাক হলো ও। বিস্ময় ভরা চোখে অহনার দিতে তাকিয়ে বললো,
'আপনি!'
অহনা মিটিমিটি হাসতে লাগলো। ও বুঝতে পারছে না ওকে দেখে সৈকত কেন এতো অবাক হচ্ছে। এমন সময় ড্রইংরুমে এলো সৈকতের ভাবী লাইজু। অহনাকে দেখে লাইজু হচকিয়ে গেল। সে অহনার দিকে তাকিয়ে বললো,
'আপনি কার কাছে এসেছেন?'
ভাবীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চট করে এর জবাব দিল সৈকত।
'ও আমার কাছে এসেছে।'
'ও আচ্ছা। তাহলে তোমরা গল্প করো। আমি চা-নাস্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'
এ কথা বলে মিষ্টি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে লাইজু ড্রইংরুম থেকে ভেতরের রুমের চলে গেল। অহনা কিছু বললো না। ও সৈকতের বিস্মিত ও অপ্রস্তুত হয়ে থাকার অভিব্যক্তি উপভোগ করছিল। সৈকত অহনাকে বললো,

‘আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন!’

অহনা সোফায় বসে পড়লো। সৈকতও ওর মুখোমুখি সোফায় বসলো। ও অহনাকে আর কোন প্রশ্ন করলো না। অহনা ভাবছিল, সৈকত হয়তো আবারো ওকে বলবে, ‘আপনি আমাদের বাড়িতে কীভাবে এলেন? কেন এলেন?’ কিন্তু সৈকত এই মুহূর্তে চুপ। এবার অহনা মুখ খুললো।

‘কাল আপনাকে অনেকবার ফোন করেছি। কিন্তু আপনি একবারও ফোন ধরেননি। এসএমএসও করেছিলাম। আপনি এরও জবাব দেননি। আপনি বুঝি খুব ব্যস্ত ছিলেন?’

এর জবাবে সৈকত মনে মনে বললো, ‘আমি আসলে কাল কেয়ার সঙ্গে ছিলাম। তাই ফোন ধরতে পারিনি। এসএমএসের জবাবও দিতে পারিনি।’ সৈকত বললো,

‘কাল আসলে পার্টির কাজে বিজি ছিলাম। আপনার ফোন না ধরতে পারিনি বলে দুঃখিত।’

সৈকত চোখে মুখে দুঃখের ছবি ফুটিয়ে তুললো। অহনা বললো,

‘ঠিক আছে, এর জন্য দুঃখিত হবার কিছু নেই। আপনি ব্যস্ত থাকতেই পারেন। তবে আজ আমাকে সময় দিত হবে। আমি একজন রাতুলের খবর পেয়েছি। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাবো।’

‘ঠিক আছে, যাবো। আমিও দুইজন রাতুলের খবর পেয়েছি। ওদের সন্ধানও করবো।’

এ কথায় খুশি হলো অহনা। ও বললো,

‘আমি যে রাতুলের খবর পেয়েছি, সে থাকে নারায়ণগঞ্জে।’

‘নারায়ণগঞ্জের কোথায়?’

‘বন্দর এলাকার সোনাকান্দা গ্রামে।’

‘ঠিক আছে। যাওয়া যাবে। তবে সোনাকান্দার রাতুলের সন্ধানে বের হলে আজকের পুরোদিন লাগবে।’

‘ইটস ওকে। আপনার সমস্যা হবে না তো?’

‘না,না। সমস্যা কেন হবে। তা ছাড়া এই কাজের জন্য আমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। তাইনা?’

এ কথা বলে সৈকত হাসার চেষ্টা করলো। অহনা কিছু বলতে যাচ্ছিলো। এ সময় ড্রইংরুমে ট্রে-তে চা ও মিষ্টি নিয়ে প্রবেশ করলো সৈকতের ভাবী লাইজু। লাইজুর চোখে-মুখে মিষ্টি হাসির ঝিলিক। সৈকত বুঝতে পারছে ওর ভাবীর চোখে মুখে ফুটে থাকা হাসির অর্থ। অহনা অবশ্য এ সব কিছু বুঝতে পারছে না বলে মনে হচ্ছে সৈকতের। উন্নত দেশে থাকলে ছেলে-মেয়েদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে যায়। কিছু মনে না করার এক ধরনের সরলতা তাদের মানসিকতা গড়ে ওঠে। লাইজু ট্রে টেবিলে রেখে অহনাকে একটি প্লেটে মিষ্টি তুলে দিয়ে বললো,

‘মিষ্টি দিয়েই তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হোক। আমার নাম লাইজু। আমি সৈকতের ভাবী।’

লাইজু এমনভাবে কথা বললো যেন অহনার সঙ্গে বিশেষ ভাব করছে। অহনা লাইজুর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলো। কেউ কেউ আছেন যারা সবসময় হাসিখুশি ও প্রাণবন্ত থাকেন এবং

অপরিচিতজনকে চট করেই কাছে টেনে নিতে পারেন, লাইজু সেরকম একজন নারী। অহনা লাইজুর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো,
'আমার নাম অহনা।'
'বাহ! খুউব সুন্দর নাম!'
বললো লাইজু। আহনা বললো,
'থ্যাংকস এ লট।'
'তা তুমি থাকো কোথায়?'
'অষ্ট্রেলিয়ায়।'
'অষ্ট্রেলিয়ায়! বলো কি!'
এ কথা বলেই লাইজু সৈকতের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালো। এই দৃষ্টির অর্থ 'অহনার সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কীভাবে?' সৈকত মুচকি হেসে ওর ভাবীকে বললো,
'অহনা ঢাকায় এসেছে একটা জরুরি কাজে। আমি তাকে সাহায্য করছি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় দু' সপ্তাহের বেশি নয়। বুঝলে?'
'বুঝলে' শব্দটি জোর দিয়ে উচ্চারণ করেছে ও। এর মধ্যে ম্যাসেজ হচ্ছে, তুমি যা ভাবছো, তা ঠিক নয়। লাইজু একটু চুপসে গেল। ও অহনার দিকে তাকিয়ে বললো,
'তা সময় পেলে চলো এসো আমাদের বাড়ি। তোমার কাছ থেকে অষ্ট্রেলিয়ার গল্প শুনবো।'
অহনা চামচ দিয়ে কেটে মিষ্টি খাচ্ছিলো। ও লাইজুর দিকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। সৈকতের চোখে চোখ রেখে ওর ভাবী চোখ নাচালো। এতে না হেসে পারলো না সৈকত। ওর ভাবী যে ইঙ্গিত করছে, তা কখনো হবার নয়। অহনা হচ্ছে দূর আকাশের ধ্রুবতারা। বিশাল দূরত্ব থেকে ধ্রুবতারার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়, এর কাছে গেলে পুড়ে খাঁক হবার আশংকা রয়েছে। এ কথা মনে মনে ভাবতে গিয়ে সৈকত ভাবুলতায় তলিয়ে যেতে লাগলো। না চাইলেও কখনো কখনো অনাকাঙ্খিত স্বপ্নের কক্ষপথে হারিয়ে যেতে হয় অনেককে। সৈকতও এই মুহূর্তে হারিয়ে গেল অনাকাঙ্খিত স্বপ্নের কক্ষপথে।

পাঁচ

সাঁতার না জানলেও নদীকে ভয় পায় না-নিজের সম্পর্কে এমন ধারনা ছিল অহনার। অষ্ট্রেলিয়া সমুদ্র পরিবেষ্টিত দেশ। অষ্ট্রেলিয়ার অনেক শহরের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে। শহরে ঢুকে যাওয়া সমুদ্রের ক্ষীণ শাখা-প্রশাখায় নৌযান চলাচল করছে নিয়মিত। অহনা অনেকবার চড়েছে ঐ সকল নৌযানে। কখনো ভয় লাগেনি। কিন্তু শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে গিয়ে ও নিজের মধ্যে ভয় অনুভব করলো। ছোট্ট নৌকায় ওরা শীতলক্ষ্যা পাড়ি দিচ্ছে। ঢেউ এসে নাচিয়ে দিচ্ছে নৌকা। এই ঢেউ কাঁপিয়ে দিচ্ছে অহনাকে। ওর ভয় লাগছে। অহনার ইচ্ছা করছে, সৈকতের পাশে বসে ওর হাত ধরে রাখতে। এতে হয়তো ভয়টা কমে আসতো। কিন্তু তা করা যাচ্ছে না। নৌকা চলছে ধীর

গতিতে। অহনা তকিয়ে দেখলো নৌকার মাঝি ভাবলেশহীনভাবে বৈঠা চালাচ্ছে। অহনা নিজের ভেতরের ভয় দূর করতে বা ভুলে থাকতে সৈকতের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো।

‘আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো?’

‘করুন। একটা কেন, একশ’ টা করুন।’

অহনার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো সৈকত।

‘আপনি রাজনীতিতে জড়ালেন কেন? ভবিষ্যতে কী করতে চান?’

প্রশ্ন শুনে হচকিয়ে গেল সৈকত। ও কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলো। এরপর বললো,

‘রাজনীতিতে জড়ানোর কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। স্বভাবজাত কারণে আমি স্কুল বয়স থেকে বিভিন্ন সংগঠনের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যাই। ধীরে ধীরে সামাজিক কর্মকান্ডের সম্পৃক্ত হয়ে যাই। কলেজ জীবনে এসে জড়িয়ে যাই রাজনীতিতে। সমাজ সম্পর্কে নিজের ভেতরের সচেতনা আমাকে রাজনীতির দিকে ঠেলে দেয়। এরপর রাজনীতিতে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। এটা হচ্ছে আপনার প্রথম প্রশ্নে জবাব। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, ভবিষ্যতে কী করবো এখনো ঠিক করতে পারিনি। অনেকদিন মনে হয়েছে, রাজনৈতিক নেতা হবো, এমপি হবো। দেশের মানুষের জন্য কাজ করবো। কিন্তু এখন এই স্বপ্ন দেখিনা।’

‘কেন দেখেন না?’

‘কারণ, আমাদের দেশের রাজনীতিতে ফুলের বাগান তৈরি না হয়ে তৈরি হয়েছে চোরাবালির ফাঁদ!’

‘ঠিক বুঝলাম না।’

‘আপনাকে এ কথা বিস্তারিতভাবে বোঝাতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। তবে সংক্ষেপে বলছি, আমাদের রাজনীতিতে সততা এবং আদর্শের সংকট চলছে। এই সংকট আমাদের কেবল পেছনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা নিজেরাই কখনো পথভ্রষ্ট, কখনো স্বপ্নবিমুখ হয়ে যাচ্ছি।’

সৈকতের কথায় রাজনীতি নিয়ে অহনার কৌতুহল বাড়ছে। ও বললো,

‘তারপরও এ দেশের মানুষ রাজনীতি নিয়ে অনেক মাথা ঘামায় কেন?’

‘এ স্বভাব আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকারভাবে। এ কথা সত্যি, আমাদের জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলোয় তেমন আলোকিত ছিল না। তারপরও বৃটিশ শাসনের দুই শ’ বছর এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের শাসনের নামে শোষণ ব্যবস্থা আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। নিস্পেষণ এবং নির্যাতনের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্ব পুরুষরা প্রতিবাদ করতে শেখেন। নিজের অধিকারের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কারা থাকবে, তা নিয়ে ভাবতে ছিলেন পূর্ববঙ্গের মানুষ। এই ভাবনা রাজনীতিতে চলে আসে এবং তা কালের স্রোতে প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়। পাকিস্তানী শোষকদের নির্যাতন-নিপীড়ণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা শোষক হটানোর রাজনৈতিক আন্দোলন, মিটিং মিছিল আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং তা তুমুলভাবে আলোড়িত হতে

থাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে । এভাবেই আমরা আপনার ভাষায় ‘রাজনৈতক সচেতন’ হয়ে ওঠি।
‘আমার ভাষায় মানে?’
‘আমি মনে করি, আমরা রাজনৈতিক সচেতন নই। আমরা আসলে রাজনীতি সম্পর্কে কৌতুহলী। আমরা বলতে, আমি দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের কথা বলছি। এই সাধারণ মানুষ যেমনি কৌতুহলী, তেমনি ভীষণ আবেগপ্রবণ।
‘আপনার কি মনে হয় রাজনীতিবিদরা সাধারণ মানুষের এই কৌতুহল এবং আবেগের সুযোগটা নিচ্ছেন?’
‘হ্যাঁ, নিচ্ছে। এখানেই তো আমরা পিছিয়ে রয়েছি। আমাদের রাজনীতিবিদদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। উন্নয়নের রোডম্যাপ আমাদের নেই।’
‘এটা কে করবে?’
‘রাজনীতিবিদরাই করবে। আমাদের মধ্য থেকেই একদিন কেউ দায়িত্বশীল নেতৃত্ব দেবেন। আজ নয়তো কাল। এমনদিনের আশায় তো আছি।’
‘সঠিক নেতৃত্বের কথা বলছেন? সঠিক নেতৃত্বই কি সবকিছু আমূল বদলে দিতে পারবে?’
‘আমি তা-ই বিশ্বাস করি। আমাদের এখন সঠিক নেতৃত্বই দরকার। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায়, সময় নেতৃত্ব তৈরি করে। আবার কখনো নেতৃত্ব সময়কে তৈরি করে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা ডায়নামিক নেতৃত্ব বা নেতৃত্ব সৃষ্টির সময়-কোনটাই পাইনি।’
‘এই জন্যই কি আপনি রাজনীতিতে নিবেদিত প্রাণ?’
‘ঠিক নিবেদিত প্রাণ কিনা জানি না। তবে রাজনীতি নিয়ে ভীষণ স্বপ্নপ্রবণ।’
‘আপনার স্বপ্নের থিম কি? আই মীন, কেমন একটা দেশের স্বপ্ন দেখেন?’
‘দেশের চৌদ্দ কোটি মানুষ নিরাপদে রয়েছে। দুর্নীতি নেই। হরতাল নেই। রাজনীতির নামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই। গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে সরকার বদল হচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখি।’
‘ভালো লাগলো আপনার স্বপ্নের কথা জেনে।’
‘এবার আপনার স্বপ্নের কথা এবার বলুন।’
এ কথায় হেসে ওঠলো অহনা। যেন অহনার কোন স্বপ্ন থাকতে পারে না। এমন কোন মানুষ আছে, যার কোন স্বপ্ন নেই? একটু ভাবলো সৈকত। ও আহনার হাসির বিদ্যুত চমকানো মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললো,
‘এমনভাবে হাসলেন, যেন আপনার কোন স্বপ্ন নেই। আমি কি খুব হাসির কথা বলে ফেলেছি?’
‘আসলে আমি হাসলাম অন্য কারণে।’
‘কী কারণ?’
‘বলছি। আপনার স্বপ্নের একটা তোলপাড় আছে, বর্ণাঢ্য একটি বিষয় আছে, ব্যাপ্তি আছে। স্বপ্ন পূরণের জন্য উৎকণ্ঠা আছে। স্বপ্ন পুরণ হলে তীব্র আনন্দও আছে। অথচ আপনার

স্বপ্নের সঙ্গে পুরো জাতির স্বপ্নের মিল আছে। এই স্বপ্ন পুরণ হলে জাতির কল্যাণ হবে। আর আমার স্বপ্নের মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত। এমন স্বপ্নের কথা বলাটা হাস্যকর। এ কথা ভেবেই হাসলাম। আপনি ভুল বুঝবেন না। প্লিজ!'

'আপনি অষ্ট্রেলিয়ায় লেখাপড়া করেও চমৎকার বাংলা বলেন। আমি বিমোহিত।'

'ধন্যবাদ। আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী থাকাকালে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাই। সুতরাং বাংলা ভুলে না যাওয়ায় অবাক হবার কিছু নেই।'

'ভুলে যাননি যেমন, তেমনি প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতে পারেন।'

অহনা আবারো হাসলো। সৈকত বললো,

'আপনি কিন্তু বলেননি, আপনার স্বপ্নের কথা।'

'আমার আপাতত স্বপ্ন হচ্ছে, রাতুলকে খুঁজে বের করা। আর আমার এই স্বপ্নটা আপনি পূরণ করে দিতে পারেন।'

অহনার এ কথাটি কেন জানি সহজভাবে নিতে পারলো না সৈকত। কোথাও একটা মিহিন বেদনা গলা সেধে ওঠলো। ও হঠাৎ করেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অহনা সৈকতের অন্যমনষ্কতা বুঝতে পারলো যেন। ও সৈকতের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললো,

'আপনি হঠাৎ চুপসে গেলেন যে!'

'না, চুপসে যাইনি। হঠাৎ মনে হলো, আপনার স্বপ্ন পূরণ করার মধ্য দিয়ে আমার কী লাভ হবে। আর ক্ষতিই বা কী হতে পারে।'

অন্যমনস্কতা ঝেড়ে সৈকত এ কথা বললো। ওর কথাকে ভাবুলতা ছাড়া কী আর বলতে পারে অহনা? তবে তার এই কথার মধ্যে অনুচ্চারিত এক টুকরো বেদনার আভাস রয়েছে। অহনা ছোট্ট করে হেসে বললো,

'পাঁচ লাখ টাকাটা কি কম লাভ বলে ভাবছেন?'

'অর্থের দিক থেকে পাঁচ লাখ টাকা অনেক।'

'তবে?'

'এর বিপরীতে লোকসান হতে পারে না?'

'যেমন?'

এবার হাসলো সৈকত। অনেকটা দুষ্টমী করে বললো,

'রাতুলকে খুঁজতে গিয়ে আপনার সান্নিধ্য পাচ্ছি। যখন রাতুলকে পেয়ে যাবেন, তখন তো এই সান্নিধ্য আর পাবো না। এটা কি আমার লোকসান নয়?'

এ কথার জবাবে কী বলবে অহনা। ও বুঝতে পারছে সৈকতের মধ্যে অনাহুত আবেগ কাজ করছে। এ ধরনের আবেগকে গুরুত্ব দেয়া যায় না। আবার অহনা তা উপেক্ষা করতেও পারছে না। ও তর্ক করার ভঙ্গিতে বললো,

'লাভ-লোকসান খুঁজে ব্যবসায়ীরা। আপনি তো সে রকম নন। তাছাড়া এমন কিছু লোকসান আছে, যার বর্তমান মূল্যায়নটা আপেক্ষিক। কিন্তু এর ভবিষ্যত ক্রেডিবেলিটি আছে। ধরে নিন, এটাও সেরকম।'

এর কোন জবাব দিল না সৈকত। ও শুধু ভাবতে লাগলো অহনা এমন চমৎকার বাংলা কী করে বলে। ওর কথায় ও চিন্তায় গভীরতা ফুটে ওঠে। অহনার কথায় সৈকত আবেশিত হয়ে রইলো অনেকক্ষণ। অহনা আর কোন কথা বললো না। ছোট ছোট ঢেউ ভেঙ্গে নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে তীরের দিকে। এই ছোট নৌকার মত সৈকতের মনের নদীতে একটি স্বপ্নতরীও এগিয়ে যাচ্ছে। সৈকত এর গন্তব্য জানে না।

ছয়

ফজলুল হকের বাড়ির দরোজা যে মেয়েটি খুললো, তাকে দেখে খুব চেনা চেনা মনে হলো সৈকতের, কিন্তু ও মেয়েটিকে চিনতে পরলো না। অথচ মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। মাঝেমাঝে স্মরণশক্তিতে যেন কুয়াশা জমে যায়। মাত্র কয়েক সেকেন্ড মেয়েটির মুখের দিকে এক রকম হা করে তাকিয়ে রইলো সৈকত। এরমধ্যে ও মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণ করে নিল। মেয়েটির বয়স বিশ-একুশ হবে। হালকা-পাতলা শরীর। রোগাটে বলা যায়। চোখ দুটি ডাগর না হলেও দৃষ্টিতে মায়াবী টান রয়েছে। হালকা নীল রঙের সালোয়ার পড়েছে। সালোয়ারের গলা থেকে বুক অব্দি কাচের নকশা। কিন্তু পায়জামা পড়েনি ও। পড়েছে জিন্স প্যান্ট। গলায় ওড়না নেই। ফলে সালোয়ার ও প্যান্টে মেয়েটিকে অন্যরকম লাগছে। সৈকতের দৃষ্টির সামনে মেয়েটি নিঃসঙ্কোচিত নয়। বরং কেমন সপ্রতিভ। মেয়েটি চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করলো,
‘কাকে চাই?’
এর জবাব তাৎক্ষণিকভাবে দিতে পারলো না সৈকত। মেয়েটি আবারো বললো,
‘কাকে চাই? আপনি কে? কার কাছে এসেছেন?’
‘এটা কি ফজলুল হক সাহেবের বাড়ি?’
এই প্রশ্নটি করেই সৈকতের মনে হলো ও এই প্রশ্নটি না করলেও পারতো। কারণ, ও নিশ্চিত এটি ফজলুর হকের বাড়ি। এই বাড়িতে ও অনেকবার এসেছে। বরং প্রশ্ন করা উচিত ছিল ‘ফজলুল হক সাহেব বাড়ি আছেন কি?’
‘হ্যাঁ, এটা ফজলুল হকের বাড়ি। আপনি?’
‘আমি তার বিশেষ পরিচিত। আমার নাম সৈকত।’
এবার মেয়েটি দরোজা থেকে সরে দাঁড়ালো। বললো,
‘ভেতরে আসুন।’
সৈকত বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলো। বলা যায় ফজলুল হকের বাড়ির দরোজা সবসময় খোলা থাকতো। বাড়ির দরোজায় কেউ প্রশ্ন করতো না ‘কে? কাকে চাই?’ রাজনীতিবিদদের বাড়িতে কত লোকের আনাগোনা তার হিসাব রাখা যায় না। তাদের দরোজা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজকের ঘটনা সৈকতকে একটু চিন্তিত করলেও ওর খারাপ লাগছে না। সৈকতের চিন্তায় ছেদ কেটে দিয়ে মেয়েটি বললো,
‘আপনি এখানে বসুন। আমি বাবাকে খবর দিচ্ছি।’

মেয়েটির এ কথা শোনামাত্র ওকে চিনতে পারলো সৈকত। ও হচ্ছে ফারিয়া। ফারিয়া হচ্ছে ফজলুল হকের মেয়ে। সৈকত ওকে দেখেছে কমপক্ষে আট বছর আগে। তখন অনেক ছোট ছিল ও। ফারিয়া দার্জিলিংয়ে লেখাপড়া করছে-এটুকু শুধু ও জানতো। আজ ফারিয়াকে দেখে ও কেন চিনতে পারলো না এ নিয়ে নিজের মধ্যে কেমন বিস্ময় তৈরি হলো। ও মুখে কিছু বললো না। ও বসে পড়লো সোফায়। ফারিয়া চলে গেল ভেতরের রুমে। সৈকত ডুবে গেল ফজলুল হককে নিয়ে নিজের ভাবনার ভূবনে।

রাজনৈতিক নেতা হিসাবে ফজলুল হককে সৈকত ভীষণ পছন্দ করে। সমানভাবে শ্রদ্ধাও করে ও। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, তার কাছে কোন সমস্যা নিয়ে এলে এ পর্যন্ত বিফল মনে ফিরতে হয়নি ওকে। তার কাছে সাহায্য চেয়ে কেউ খালি হাতে ফিরেছেন, এমন কথা শুনেনি সৈকত। পার্টির জন্য মিছিল-সমাবেশ করতে অর্থের সংকট হলে সৈকত চিন্তিত হয়নি কখনো। ও চলে আসে ফজলুল হকের কাছে। তিনি অর্থের ব্যবস্থা করে দেন। অবশ্য তিনি কখনো নিজের পকেট থেকে অর্থ দেন না। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ফোন করে দিতেন। সৈকত ঐ সকল ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতেন। তারা সৈকতের হাতে অর্থ তুলে দিতেন। ফজলুর হকের সঙ্গে বিভিন্ন স্থরের লোকের সঙ্গে গভীর সখ্যতা রয়েছে। তিনি যে কত লোককে চেনেন, তিনি নিজেও হয়তো বলতে পারবেন না। ব্যবসায়ী, আমলা, ডাক্তার, রাজনীতিবিদ, ছোট-বড় চাকুরীজীবী, শ্রমিক নেতা, পুলিশ এমনকি মাস্তানদের পর্যন্ত তিনি চেনেন। শুধু ঢাকায় নয়, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার সম্পর্কের শেকড় ছড়িয়ে রয়েছে। কীভাবে তিনি বিভিন্ন পেশার এতো মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের জাল তৈরি করেছেন, কে জানে! এ কথা ভাবলে সৈকতের বিস্ময় কাটে না। অর্থ সংকট ছাড়াও ছোট-খাটো তদবির বা কোন সমস্যা নিয়ে তার কাছে এসে সৈকত কখনো বিফল হয়নি। তাই ফজলুর হকের প্রতি সৈকতের অগাদ শ্রদ্ধা। এই লোকটি পার্টির জন্য নিবেদিত প্রাণ। অথচ পার্টির মহানগর কমিটির বড় কোন পদ তিনি দীর্ঘদিনেও পাননি। তিনি মহানগর কমিটির সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে আটকে আছেন। ভোটাভুটি হলে তিনি মহনানগর কমিটির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক হয়ে যেতে পারতেন অনেক আগেই। কিন্তু পার্টির মধ্যে ভোটাভুটির চর্চা নেই। উপর থেকে কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। ফলে শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বিশেষ পছন্দের মানুষ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে নিয়েছে। ফজলুল হক পার্টির নেতা-কর্মীদের কাছে জনপ্রিয় হলেও পার্টিতে তার পদন্নোতি হয়নি। এ নিয়ে সৈকতের আক্ষেপ রয়েছে। কিন্তু ফজলুল হকের যেন আক্ষেপ নেই। কিংবা হয়তো আক্ষেপ আছে, এর প্রকাশ তিনি করেন না।

সৈকত ফজলুল হকের বাড়ির ড্রইংরুমে বসে কথাগুলো ভাবছিল। এরমধ্যে বাড়ির কাজের বুয়া মরিয়ম ওর সামনে চা ও বিস্কুট রেখে গেছে। সৈকত ও সব স্পর্শ করেনি। ফজলুল হকের বাড়িতে সৈকত যতবার এসেছে, ততবারই লোকজন দেখেছে। কিন্তু আজ কোন লোক নেই। ড্রইং রুমে ও একা বসে আছে। এর কারণ হতে পারে, দেশে জরুরি আবস্থা চলছে। শর্তসাপেক্ষে ঘরোয়া রাজনীতি চললেও রাজনীতির অঙ্গনে প্রাণ নেই। সকলের মধ্যে

অজনা ভয় কাজ করছে। সামরিক সরকার কিংবা সামরিক মদদপুষ্ট সরকারকে রাজনীতিবিদরা কখনোই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। সাধারণ মানুষেরও এ ধরনের সরকারের প্রতি সমর্থন থাকে না। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট ভিন্ন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই সরকারের নির্ভীক পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। চুপসে গেছেন রাজনীতিবিদরা। সন্দেহ ও কৌতুহলীও রয়েছে অনেকের মনে। এমনি পরিস্থিতিতে ফজলুল হকের বাড়িতে মানুষের উপস্থিতি না থাকাটা অস্বভাবিক নয়, ভাবলো সৈকত।

'আরে সৈকত যে!'

ড্রইংরুমে প্রবেশ করেই ফজলুল হক ভরাট গলায় বিস্ময় প্রকাশ করলেন। ফজলুল হক বরাবরের মত পায়জামা-পাঞ্জাবী পড়েছেন। কাঁধে ভাঁজ করা একটি শাল ঝুলছে। সৈকত সোফা থেকে অনেকেটা লাফিয়ে উঠে গিয়ে ফজলুল হকের সামনে চলে গেল এবং ও চট করে মাথা নুয়ে তাকে সালাম করলো। ও সবসময় এ কাজটি করে। ফজলুল হক ওকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিলেন। এরপর সৈকতকে বাহুমুক্ত করে বললেন,

'বেশ কয়েকদিন ধরে তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি তো অনেকদিন হয় আসোনা!'

'একটু ব্যস্ত ছিলাম ফজলু ভাই।'

'তা কি খবর?'

'খবর তো আপনি দেবেন।'

'তা চারপাশে কি দেখছো?'

'সবাই যা দেখছে, তাই দেখছি।'

'সবার মত করে তো তুমি দেখলে হবে না। তোমাকে অন্যভাবে দেখতে হবে। তোমরা দেশের নেতৃত্ব দেবে। তাইনা?'

'এ সব কথা এখন আর বিশ্বাস করতে চাইনা ফজলু ভাই?'

'কেন?'

'রাজনীতির আড়ালে যে অবক্ষয় চলছে, এর দায়-দায়িত্ব এখন কে নেবে?'

'তুমি দুর্নীতির কথা বলছো?'

'এটাই তো আমাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় এবং বিব্রতকর অভিযোগ, তাইনা?'

'এই অভিযোগ ঢালাওভাবে সকলের বিরুদ্ধে। শুধু খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা এর জন্য দায়ী নন। এর জন্য দায়ী আমলা-কর্মকর্তা থেকে আরো অনেকে। অথচ দেখো খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনাসহ সাবেক বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে কারাবন্দি করে সরকার বাহাবা নিচ্ছে। এই সরকার কি দুর্নীতিবাজ সবাইকে ধরেছে বা ধরছে?'

ফজলুল হকের এই প্রশ্নটি সৈকতেরও। সুতরাং এই প্রশ্নের জবাবে ও কিছু বললো না। ফজলুর হক একটু চুপ থেকে বললো,

'তা যাই-ই হোক। চোখ-কান খোলা রাখো। প্রস্তুত থাকো।'

'কিসের জন্য প্রস্তুত থাকবো?'

এ কথায় হেসে ফেললেন ফজলুল হক। মনে হলো সৈকতের কথায় তিনি না হেসে পারলেন না। হাসি থামার পর তিনি বললেন,
'তা তুমি কেন এসেছো বলো। তোমার কথা শোনা হয়নি।'
একটু ইতস্তত ভাব এসে গেল সৈকতের। ও ইতস্তুতভাবে বললো,
'আমি এবার অন্যরকম একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি। আপনার সাহায্য ছাড়া মনে হচ্ছে, এই সমস্যার সমাধান সহজে হবে না।'
'আহা! সমস্যাটা কি বলে ফেলো?'
'আমি একটি ছেলেকে খুঁজছি। ও অষ্ট্রেলিয়ায় থাকতো। সিডনীতে। এখন দেশে ফিরে এসেছে। ওকে আমার খুঁজে বের করতে হবে। ছেলেটির নাম রাতুল। ওর নাম ছাড়া আমার কাছে আর কোন তথ্য জানা নেই।'
কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ফজলুল হক। সৈকত তার মুখের দিকে আশার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। একটু ভেবে তিনি সৈকতকে বললেন,
'তুমি কাল আমাকে ফোন করো। আশা করি, ওর পরিচয় ও ঠিকানা পেয়ে যাবে।'
'সত্যি বলছেন! কীভাবে বের করবেন!'
বিস্ময় প্রকাশ করলো সৈকত। ফজলুল হক স্বভাবসুলভ হাসিমুখে বললেন,
'এটা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। তুমি সানোয়ারা গ্রুপের নাম শুনেছো?'
'ঐ যে ডানো গুঁড়ো দুধের আমদানীকারক?'
'হ্যাঁ। ঐ কোম্পনীর চেয়ারম্যান আমার পরিচিত। তার ছেলে জাহিদ লেখাপড়া করেছে সিডনীতে। ও আবার বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের খোঁজ খবর রাখে। আশা করি, ও রাতুলের সন্ধান দিতে পারবে। রাতুল নামে আর ক'জন ছাত্রই বা সিডনীতে লেখাপড়া করেছে, বলো? ওকে আজ রাতে ফোন করবো। তুমি কাল আমাকে ফোন করো।'
ফজলুল হকের কথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সৈকত। ও জানে, ফজলুল হক যখন সমস্যা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, তখন এর সমাধান হবেই। এই জন্যই এই লোকটিকে ভীষণ ভালো লাগে সৈকতের। তাকে ম্যাজিশিয়ানও বলা যায়। সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সৈকত বললো,
'আজ তাহলে যাই, ফজলু ভাই?'
'যাবে? যাও। আজ তুমি কিছু মুখে দিলে না। চা তো ঠান্ডা হয়ে গেছে।'
এ কথা বলে তিনি হাসলেন। সৈকত বললো,
'আজ কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল না।'
'ঠিক আছে। যাও। ভালো থেকো।'
'জ্বি, আচ্ছা। কাল আপনাকে ফোন করবো।'
'করো। আর হ্যাঁ, প্রস্তুত থেকো!'
সৈকত মাথা নেড়ে ফজলুল হককে সালাম জানিয়ে তার বাড়ির ড্রইং রুম থেকে বের হয়ে এলো। ওর জন্য অহনা অপেক্ষা করছে। ওকে যেতে হবে তাড়াতাড়ি। এই মুহূর্তে ওর মনে

আনন্দের একটা ঢেউ খেলছে। রাতুলের সন্ধান পাওয়াটা ওর জন্য প্রেষ্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার সমধানটা এতো সহজে হয়ে যেতে পারে, ও অতোটা ভাবেনি। ফজলুল হকের বাড়ির দরোজা পেরিয়ে গেটের দিকে যেতেই পেছন থেকে মরিয়ম বেগমের ডাক শুনতে পেল ও।

'বাপজান, একটু দাড়ান!'

ও ঘুরে দাঁড়াতেই ফজলুল হকের বাড়ির কাজের বুয়া মরিয়ম বেগমকে ও দেখতো পেল। মরিয়ম বেগম হয়তো সৈকতের জন্য বাড়ির বাইরে কোথাও অপেক্ষা করছিল। সৈকত একটু অবাক হলো। ও এক পা দু' পা করে মরিয়ম বেগমের দিকে এগিয়ে গেল। চারপাশে সতর্ক চোখ রেখে ওর সামনেও এগিয়ে এলো মরিয়ম বেগম। সৈকতের সামনে এসে একটা খাম বাড়িয়ে বললো,

'এইট্যা তাড়াতাড়ি ধরেন! আফা দিছেন!'

সৈকত কিছুই বুঝতে পারলো না। মরিয়ম বেগম ওর হাতে খামটি ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় বাড়ির দোতালার দিকে তাকাতেই দোতালার বারান্দায় ফারিয়াকে দেখতে পেল ও। ফারিয়া ওর দিকে তাকিয়ে এক টুকরো হাসি বিলিয়ে দিয়ে বারান্দা থেকে চট করে চলে গেল। এই রহস্যের কোন কারণ খুঁজে পেল না সৈকত। ও খাম খুললো। খামের ভেতরে রাখা একটি কাগজে দু'টি লাইন শুধু লেখা। লাইন দুটি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো, 'সৈকতে কেন সমুদ্র ফিরে আসে? সৈকত কি সমুদ্রকে ভালোবাসে?' সৈকতের উদ্দেশ্যে এই দু'টি লাইন লিখে পত্র পাঠানোর উদ্দেশ্য কি? ফারিয়া কি ওকে চেনে? কিন্তু ওর সঙ্গে আজ যখন দেখা হলো তখন ফারিয়ার আচরণ দেখে মনে হয়নি, সৈকতকে ও চেনে। তবে এই দুই লাইনের কাব্য কেন? সৈকত গভীর রহস্যের অতলে হারিয়ে যেতে লাগলো। কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত রহস্যে থমকে যায় অনেকে। বিস্ময়ে হয় বিমূঢ়। সৈকতও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

সাত

শাহবাগে পাবলিক লাইব্রেরীর গেটের সামনে কারো জন্য অপেক্ষা করা মন্দ নয়। সময় কেটে যায়। এই পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে তরুণ-তরুণীদের জটলা লেগেই থাকে। বিভিন্ন তরুণ-তরুণীর যাওয়া-আসাতো আছেই। এখানে দাঁড়ালে মনটাও রোমান্টিক হয়ে যায়। চারপাশে প্রেমময় আড্ডার মৌ মৌ গন্ধ। কোলাহল আছে। উচ্ছৃলতা আছে। এরই মধ্যে এক ধরনের গাম্ভীর্যতাও আছে। পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাঙ্গনে পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তিত্বময় উপস্থিতি এক ধরনের গাম্ভীর্যতা তৈরি করে। অনেক মুখরতার মধ্যেও এই গাম্ভীর্যতা মেঘলা আকাশে রঙধনুর মত দ্যুতিময়। পাবলিক লাউব্রেরীর সামনে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো ভাবছিল সৈকত। ও অপেক্ষা করছে অহনার জন্য। অহনা আসার কথা দুটোয়। সৈকত দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা পঞ্চাশ থেকে। এখন ঘড়িতে দুটো পঁচিশ। এরমধ্যে অহনা দু'বার ফোন করে জানিয়েছে যে, ও আসছে। যানজটে আটকে গেছে। সৈকত গড়িতে

অরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল। নভেম্বর দুপুর। শীত ঝেঁকে বসেছে। সৈকত শার্টের উপর হালকা একটি স্যুয়েটার এবং এর উপরে চামড়ার জ্যাকেট পড়েছে। জীন্স রঙের জীন্সপ্যান্ট ও শাদা শার্টের উপর 'এস' রঙের স্যুয়েটার পড়েছে ও। জ্যাকেটটি কালো রঙের। পায়ে শাদা রঙের ক্যাডস। সৈকত আজ ওর পছন্দের পোষাক পড়েছে। অবচেতন মনের ইঙ্গিত ও উপেক্ষা করতে পারেনি। ওর অবচেতন মন ওকে পরিপাটি হতে বলেছে। অহনাকে নিয়ে যেতে হবে উত্তরায়। অহনার সঙ্গে কোথাও যাবার প্রোগ্রাম তৈরি হলে ওর মধ্যে এখন পরিপাটি থাকার চিন্তা ভীষণরকম কাজ করে। সৈকত অহনাকে নিয়ে নিজের মধ্যে আলো-ছায়ার মত একরকম ভাবাবেগ টের পাচ্ছে। কিন্তু মনের ক্যানভাসে পুরোপুরি চিত্র তৈরি করতে পারছে না। এই অসম্পূর্ণ ও অযাচিত আবেগ অর্থহীন হলেও এর অস্থিত্ব ভালো লাগছে ওর। ও এই আবেগকে নিজের মধ্যে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। এ সব কথা নানাভাবে ভেবে অপেক্ষার সময় পার করছে ও। ওর মাথার উপর শীতের দুপুর। আজ শীত প্রবল হলেও সূর্য কিরণ প্রখর। বাতাসের দাপট কম। পাবলিক লাইব্রেরীর গেটের সামনে ফুতপাতে দাঁড়িয়ে শীতটাকে উপভোগ করছিল ও। এক সময় সৈকতের স্বপ্নঘোর চটকে দিয়ে একটি টয়োটা করোল্লা কার এসে ওর সামনে ব্র্যাক কষলো। কারটি দেখে সৈকতের চোখ প্রথমে উজ্জ্বল হয়ে গেল। ও ধরে নিয়েছিল অহনা এসে গেছে। কিন্তু গাড়িটির পেছনের আয়না যখন নামলো, তখন ও কেয়াকে দেখতে পেল। অনেকটা ভূত দেখার মত চমকে উঠলো ও। ওর বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠলো। কেয়া এখানে কেন এসেছে-ও তা বুঝতে পারছে না। ও সমূহ বিপদের আশংকায় বিচলিত হলো। এখন যদি অহনা চলে আসে, তবে একটা বিচ্ছিরি ঘটনার মুখে পড়বে ও। কেয়াকে না হয় অহনার পরিচয় দেয়া যাবে, কিন্তু অহনার কাছে কেয়ার কী পরিচয় দেব ও। অহনাকে কি বলা যাবে, 'ও হচ্ছে কেয়া, আমার প্রাক্তন প্রেমিকা। প্রেমিকা মানে ওয়ান সাইটেড লাভ! কেয়া আমাকে কখনো ভালোবাসেনি। নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে শুধু!' সৈকতের ঘাবড়ে যাওয়া ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে কেয়া বললো,

'অমন হা করে কী দেখছো? অনেক হয়েছে, এবার গাড়িতে উঠো।'

কেয়ার কথা যেন শুনতেই পেলনা সৈকত। ও হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলো। ওর চিন্তায় এলোমেলো হাওয়া বইছে। কেয়া এবার উঁচু গলায় বললো,

'এই যে রাস্তার রোমিও, গাড়িতে উঠো!'

সৈকত একটু নড়ে উঠলো। ও বললো,

'তুমি! এখানে! কী ব্যাপার!'

বিস্ময় উজার করে ঢেলে দিল ও। কেয়া বললো,

'সব প্রশ্নের জবাব দেব। আগে গাড়িতে উঠো।'

'কেন? কোথায় যাবো?'

'জাহান্নামে! কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে উঠো।'

'না, মানে, আমার গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।'

'আমারও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। উঠো!'

'আহা! তোমার সঙ্গে কাল দেখা করি।'

ককিয়ে ওঠে সৈকত। কেয়া নাছোরবান্ধার মত বলে,

'তুমি গাড়িতে না উঠলে আমিও নড়ছি না। দেখবো তোমার কী কাজ!'

কেয়ার কথায় বিপদের গন্ধ পেল সৈকত। কেয়ার মধ্যে বেপরোয়াভাব। সৈকত জানে, ও আর এখান থেকে নড়বে না। আর যে কোন সময় অহনা চলে আসবে। অহনা কেয়ার মুখোমুখি পড়লে ব্যাপারটি কোনদিকে গড়াবে, কে জানে! সৈকত নিজের মধ্যে ভয় টের পেল। কেয়া ফের বললো,

'তুমি গাড়িতে উঠবে, নাকি আমি গাড়ি থেকে নামবো?'

সৈকত বিরক্ত মুখে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। এই মুহূর্তে মনে হলো কেয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখাটা ওর ঠিক হয়নি। এর কোন অর্থ হয়না। এর মধ্য থেকে কোন প্রাপ্তি নেই। বরং হারানোর ভয় আছে। কেয়ার সঙ্গে পুরানো সম্পর্কটা পুনরায় গড়ে তোলার জন্য এই মুহূর্তে সৈকতের ভীষণ অনুশোচনা হতে লাগলো। ও কেয়ার পাশে বসে চুপসে আছে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। সৈকত ওর সেলফোনটি অফ করে দিল। কারণ অহনা ফোন করলে ও কথা বলতে পারবে না। এই মুহূর্তে কেয়ার সামনে ও অহনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে না। শাহবাগে মোড় পেরুতেই গাড়ির গতি বেড়ে গেল। কেয়া এবার বললো,

'তা ঐখানে দাঁড়িয়ে কার জন্য অপেক্ষা করছিলে?'

সৈকত এর কোন জবাব দিল না। ও ভাবছে অহনা ওকে না পেয়ে কী ভাববে? কেয়া ফের বললো,

'সৈকত, আমি তোমার সঙ্গে আজ চূড়ান্ত আলোচনা করতে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।'

'কী নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা?'

বিরুক্তি প্রকাশ করে জানতে চাইলো সৈকত। কেয়া বললো,

'সেটা হচ্ছে তোমার আমার সম্পর্ক নিয়ে। আমাদের পরিণতি কী হবে, তা নিয়ে।'

'ঠিক আছে, বলো কী জানতে চাও।'

'প্রথমে বলো, তুমি গত দুই সপ্তাহ যাবত আমাকে কেন উপেক্ষা করছো? আমার কোন ফোন ধরোনি। তুমি একবারও ফোন করোনি। একটি এসএমএস-এর জবাবও দাওনি। কেন?'

'আমি ব্যস্ত ছিলাম। ভীষণরকম ব্যস্ত আছি।'

'এতো ব্যস্ত যে আমাকে ভুলে থাকতে পারলে! কী এমন কাজ, শুনি?'

'কেয়া, এটা তোমার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ। বাড়াবাড়িটা তুমিই শুরু করেছো।'

'মানে!'

'মানে খুব সহজ। তুমি বুঝতে পারছো না?'

'কেয়া তোমার কী হয়েছে, বলো তো! এ্যানি প্রবলেম উইথ ইওর হাজব্যান্ড?'

‘সমস্যা হলে তুমি কী করবে? আমাকে বিয়ে করে আমার ইষ্টুপিট হাজব্যান্ড থেকে মুক্ত করবে?’
কেয়ার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না সৈকত। ও হচকিয়ে গেল। এই প্রশ্নটি এর আগেও বিভিন্ন সময়ে করেছে কেয়া। এর জবাবে ও বলেছে, ‘হ্যাঁ, তোমাকে বিয়ে করবো।’ কেয়া এই প্রশ্নটি করেছে রসিকতা করে, সৈকতও জবাব দিয়েছে রসিকতার মত। কিন্তু কেয়া কখনো সিরিয়াসভাবে এই প্রশ্নটি করেনি। আজ ও সিরিয়াস। সৈকত কিছুক্ষণ চুপ থেকে শান্ত গলায় বললো,
‘কেয়া তোমার কী হয়েছে, বলোতো? তুমি কোথায় গিয়েছিলে? এই গাড়ি কার?’
‘আমি কোথাও যাইনি। তোমাকে অনুসরণ করছিলাম। গাড়ি ভাড়া নিয়েছি।’
কেয়ার কথা শুনে ভীষণ অবাক হলো ও। বললো,
‘আমাকে অনুসরণ করছিলে? কেন?’
‘শুধু জানতে কেন তুমি আমাকে উপেক্ষা করছো।’
‘আশ্চার্য! তুমি পাগল হয়ে গেছো!’
‘তুমি ভাবছো আমি তোমার জন্য পাগল! তাহলে তুমি বোকার স্বর্গে বাস করছো।’
কেয়ার কথায় শ্লেষ। সৈকত বললো,
‘না। আমি জানি, তুমি আমার জন্য পাগল নও। কখনো ছিলেও না।’
‘এ কথা জেনেও তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করছো?’
প্রশ্ন করলো কেয়া।
‘তোমার সঙ্গে কি আমি সত্যিই প্রেম করছি, কেয়া? তুমিও কি আমার সঙ্গে প্রেম করছো?’
পাল্টা প্রশ্ন করলো সৈকত। কেয়া বললো,
‘আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করছি না, ঠিক। তাহলে তুমিও কি আমার সঙ্গে আমারই মত প্রেমের অভিনয় করছিলে?’
‘বেশ ভালো প্রশ্ন করেছো। সত্যি কথা বলতে কি, আমি অভিনয় পারি না। আর ‘অভিনয়’ বা ‘ভান’ করে তোমরা তোমাদের ভূবন সাজিয়ে রেখেছো।’
‘তাই নাকি! এটা জেনেও আমাকে ভালোবাসতে?’
‘তোমাকে আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবাসোনি। আবার আমাকে ছেড়েও দাওনি। ‘অভিনয়’ নামক অস্ত্রটা আমার উপর চালিয়েছো। এখনো ঐ অস্ত্রটা চালিয়ে যাচ্ছো।’
‘এ কথা জানার পরও তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে কেনো? কোন লোভে? নাকি প্রতিশোধ নিতে?’
কেয়ার এই প্রশ্নের জবাব তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া যায় না। সৈকত মনে মনে কেয়ার উদ্দেশ্যে বললো, ‘প্রত্যাখ্যানের আঘাত ভালোবাসাকে লাঞ্চিত করে আর প্রবঞ্চনার জ্বালা ভালোবাসাকে ঘৃণায় পরিণত করে, তুমি আমাকে দুটোর স্বাদই দিয়েছো। তোমার বিয়ের দুই বছর পর যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো, তখন তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা

বলতে কিছু নেই। তবে একরকম মোহ আমাকে টেনে নিয়ে গেছে তোমার কাছে। মোহটা নিয়েই আমি তোমার সঙ্গে এক ধরনের সম্পর্ক ধরে রাখছিলাম।'

কিন্তু মুখে কিছু বললো না সৈকত। কেয়া ফের বললো,

'মুখ গোমড়া করে বসে আছো কেন? আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'কেয়া তোমার কী হয়েছে? এমন করছো কেন? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'

'তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। আপত্তি আছে?'

'এটা তুমি কখনোই করবে না, তা আমি জানি।'

'কেন এমন মনে হচ্ছে?'

'কারণ, বিত্তের প্রতি তোমার গভীর দুর্বলতা। ভবঘুরে শ্রেণীর রাজনীতিবিদকে নিয়ে গল্প করে সময় কাটানো যায়, অতি গোপনে প্রেম প্রেম খেলায় মেতে থাকা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে সংসার করা যায় না। তাইনা?'

'আর যদি সত্যি সত্যি তোমার কাছে চলে আসি!'

এর কোন জবাব দিল না সৈকত। অন্য সময় হলে রসিকতা করে বলতো, 'চলো আসো, গ্রহণ করবো'। কিন্তু এখন রসিকতার সময় নয়। কেয়া ফের বললো,

'প্রশ্নটার জবাব চাই। তোমার কাছে চলে আসলে আমাকে গ্রহণ করবে?'

সৈকত নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। ওর মনে হলো কেয়ার সঙ্গে আর লুকোচুরি খেলা ঠিক হবে না। ওদের সম্পর্কের যবনিকা এসে গেছে। ও বললো,

'দেখো কেয়া, বাস্তবতা হচ্ছে, তুমি বিত্তশালী স্বামীকে ছেড়ে আমার কাছে আসতে পারবে না। আবার চলে এলেও আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারবো না। তোমার আমার মধ্যে যে সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে, ওখানে প্রেম নেই।'

'রিয়েলী! তাহলে তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছো? ভালোবাসার অভিনয় করেছো?'

'না, তা নয়। তোমাকে আমি ভালোবাসতাম। তা ছিল একটা সময়ের এক পশলা আবেগ। তোমার সঙ্গে আবার যখন যোগাযোগ হলো, তখন আমি ভালোবাসার দাবি নিয়ে কখনো তোমার সামনে দাঁড়াইনি। তুমি জানতে তোমার প্রতি আমার দুর্বলতার কথা। তুমি এটাকে ব্যবহার করেছো। তুমি চাইতে বা এখনো চাও, আমি তোমাকে আগের মতই ভালোবাসবো। পাগলের মত ভালোবেসে যাবো। আর তুমি দূর থেকে আমার অসহায় পাগলামীকে উপভোগ করে যাবে। বিত্ত-বৈভবের বিলাসি জীবন-যাপনে তৃপ্ত হতে পারোনি তুমি। অখন্ড অবসরের অবসাদ ছিল তোমার। তাই আমাকে পেয়ে তোমার মধ্যে এক ধরনের খেলার প্রবণতা জেগে ওঠে। প্রেমের অভিনয়ের খেলা। সেই পুরানো খেলাতেই মেতে উঠলে তুমি।'

'আর তুমি?'

'এবার আমি আগের মত বোকা প্রেমিক ছিলাম না। আমি শুধু তোমার চালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিলাম।'

'চলছিলাম মানে, এই খেলা তাহলে শেষ।'

‘হ্যাঁ। এবার এর যবনিকা টানতে হবে। হবে কি, এ সব কথা বলে ফেলার পর আর খেলা চলে না। তাইনা?’

কেয়া আর কিছু বললো না। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। কেয়ার এই কান্নাকে সহজভাবে নিল সৈকত। মুখের উপর যে কথাগুলো ও বলে দিয়েছে, তা শুনে যে কোন মেয়ে কাঁদবে। অন্তত লজ্জায় হলেও কাঁদবে। সৈকত বাইরে তাকিয়ে দেখলো গাড়ি উত্তরা দিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি কোথায় যাচ্ছে, কে জানে। কেয়া নিশ্চয় ড্রাইভারকে আগেই বলে রেখেছে কোথায় যেতে হবে। ও একটু চিন্তিত হলো। গাড়ি শহর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। কেয়া ওকে বিপদে ফেলে দেবে না তো? নিজের ভেতরে অজানা ভয় ডানা মেললো। কেয়া চোখের জল মুছে নিল। সৈকত অপরাধীর মত চুপ করে আছে। কেয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,

‘সৈকত, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে ‘অভিনয়টা’ই মূখ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।’

সৈকত কিছু বললো না। ও গাড়ির আয়না দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। কেয়া ফের বললো,

‘কিন্তু সৈকত তারপরও তোমকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে একদিন।’

কেয়ার কথায় চমকে উঠলো সৈকত। ও মুখ ঘুরিয়ে কেয়ার দিকে তাকালো। বললো,

‘কেন এ কথা বললে?’

‘অহনাকে তুমি পাবে না!’

কেয়ার এ কথায় ভীষণ অবাক হলো সৈকত। কেয়া কেন এ কথা বললো, ও বুঝতে পারলো না। কিন্তু ওর মধ্যে একটা তোলপাড় শুরু হলো। অহনার প্রতি ও কি দুর্বল? যদি দুর্বল হয়েও থাকে, এটা কেয়া জানলো কি করে? সৈকত কেয়ার এ কথার কোন জবাব দিল না। ও চুপসে গেল। ওর মনে হলে, কেয়া ওকে অভিশাপ দিলো। ওর মন খারাপ হয়ে গেল। কেয়া আর কিছু বললো না। ও ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বললো,

‘ড্রাইভার গাড়ি ঘুরাও। শাহবাগে যাও।’

সৈকত স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললো। আর যাই হোক, কেয়ার সঙ্গে আজ বোঝাপড়া হয়ে গেল। তারপরও এক ধরনের কষ্টবোধ গ্রাস করছে ওকে। কেয়াকে এভাবে কঠিন কথাগুলো বলে ফেলে নিজের কাছে লজ্জাও লাগছে। শাহবাগ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সৈকত এবং কেয়া দুজনেই আর কোন কথা বললো না। কথা না বলারও একটা কষ্ট টের পেল সৈকত।

আট

রাতুলকে এতো সহজে পেয়ে যাবে, তা কল্পনাও করেনি সৈকত। একেই বলে ফজলুল হকের ম্যাজিক। ফজলুল হক আজ সকালে নিজেই ফোন করে রাতুলের সেলফোন নম্বর দিলেন। সৈকত বাসা থেকে বের হচ্ছিলো। এ সময় ফজলুল হকের ফোন এলো। রাতুল হ্যালো বলতেই ও প্রান্ত থেকে ফজলুল হক বললেন,

‘সৈকত, তুমি যে রাতুলকে খুঁজছিলে, তার সেলফোন নম্বর পাওয়া গেছে। লিখে নাও।’

ফজলুল হকের কথা শুনে হঠাৎ করে সৈকতের হৃৎকম্পন বেড়ে গেল। ও তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কলম ও কাগজ বের করে রাতুলের নম্বরটি লিখে নিল। রাতুলের ফোন নম্বর দিয়ে ফজলুল হক বললেন,
‘আমাকে জানিয়ো এই রাতুলকেই খুঁজছিলে কিনা।’
‘জ্বি, আচ্ছা। আপনাকে অবশ্যই জানাবো। আমার যে কী উপকার হলো, তা বলে বোঝাতে পারবো না।’
‘বুঝতে পারছি। কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে, ফোন করো।’
‘জ্বি, আচ্ছা।’
‘আর হ্যাঁ, ফারিয়া তোমার কথা বলছিলো। তুমি নাকি ভালো গান গাও?’
ফজলুল হকের এই প্রশ্নে ভীষণ অবাক হলো সৈকত। গান সম্পর্কে ফজলুল হকের কখনো আকর্ষণ আছে বলে জানে না ও। তার সব কথা রাজনীতি নিয়ে। সব আকর্ষণ রাজনীতিতে। এই প্রথম তিনি সৈকতের সঙ্গে গানের কথা বলছেন। সৈকতের গানের গলাটা খারাপ নয়। এক সময় গানের চর্চাও ও করতো। মিটিং-মিছিলে শ্লোগান ও বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে গলার অবস্থা এখন বেহাল। সৈকত গান গায় না অনেক বছর হলো। ফারিয়া ওর গানের কথা জানলো কী করে? জানলেও এ কথা সে ওর বাবাকে কেন বলেছে? ফারিয়ার উদ্দেশ্য কি? সৈকতের মনে প্রশ্নগুলো একসঙ্গে উঁকি দিল। ফজলুল হকের কণ্ঠ ফের ভেসে এলো ফোনের ও প্রান্ত থেকে।
‘কী হলো, কিছু বলছো না যে! তুমি কি সত্যিই গান গাও নাকি?’
সৈকত নিজেকে সংযত করে বললো,
‘একসময় একটু আধটু গান গাইতাম। তবে বলার মতো তেমন কিছু নয়, ফজলু ভাই।’
‘ঠিক আছে, একদিন তোমার গান শুনবো। বাড়িতে একটা পার্টি দেব শিগগিরই। কী বলো?’
‘তা দিয়েন। তবে যতটা ভাবছেন, আমি ততটা ভালো শিল্পী নই। এখন আর কণ্ঠে সুর ওঠতে চায় না।’
‘তারপরও গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমার মেয়ে তোমার গানের খুব ভক্ত। কবে কোথায় নাকি ও তোমার গান শুনেছিলো।’
ফজলুল হকের এ কথা শুনে অস্বস্থি হতে লাগলো সৈকতের। এর জবাবে ও কী বলবে, তা বুঝতে পারছে না। সৈকতের কোন সাড়া না পেয়ে ফজলুল হক বললেন,
‘ঠিক আছে, আমি ফোন ছাড়ছি। তুমি রাতুলকে ফোন করে নিশ্চিত হও, এই রাতুলকেই তুমি খুঁজছো কিনা। তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে।’
‘ঠিক আছে ফজলু ভাই। স্লামালাইকুম।’
‘অলাইকুম, সালাম’।
ফজলুল হক ফোন কেটে দিলেন। সৈকত একটু চিন্তিত হলো ফারিয়াকে নিয়ে। ফারিয়া ওকে নিয়ে কেন এই রহস্য করছে, ও বুঝতে পারছে না। সৈকত ফারিয়ার কথা মাথা থেকে

ঝেড়ে ফেলে দিল। ও আর দেরী করতে চায় না। ও ফোন করলো রাতুলকে। ও প্রান্তে ফোন পিকআপ করলো রাতুল,

‘হ্যালো।’

‘হ্যালো, আপনি রাতুল বলছেন?’

‘হ্যাঁ, আপনি?’

‘আমাকে চিনবেন না।’

‘তাহলে আমাকে ফোন করেছেন কেন?’

রাতুলের এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সৈকত প্রশ্ন করলো,

‘আপনি কি রায়নাকে চেনেন?’

ও প্রান্ত্যে কোন সাড়া নেই। সৈকত নিশ্চিত হলো যে রাতুলকে অহনা খুঁজছে, এ সেই ব্যক্তি। রায়নার নাম শোনামাত্র চুপসে গেছে। সৈকত ফের বললো,

‘আমি ঠিক জানি না, আপনি সেই রাতুল কিনা।’

‘আপনি কে?’

‘আমার নাম সৈকত। আমরা এক রাতুলকে খুঁজছি, যিনি সিডনীতে ছিলেন।’

‘আমি সিডনীতে ছিলাম।’

‘আপনি কি রায়নাকে চিনতেন?’

‘কেন এই প্রশ্ন করছেন?’

রাতুলের এই পাল্টা প্রশ্নে সৈকত বুঝতে পারলো কোথাও একটা সমস্যা তৈরি হয়ে আছে। রাতুল রায়নাকে চেনে কিন্তু রায়নাকে নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছে না। কী হতে পারে এর অন্তর্নিহিত কারণ? প্রশ্নটি ভেবে একটু কৌশল অবলম্বন করতে বললো,

‘না, মানে, রায়না ভীষণ অসুস্থ কিনা!’

‘রিয়েলী! কী হয়েছে ওর?’

এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সৈকত। বললো,

‘না, মানে, আপনাকে খুঁজে পাচ্ছেনা বলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলো একবার!’

‘বলেন কি!’

রাতুলের কণ্ঠ থেকে যেন আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। সৈকত রাতুলের মুখ দেখতে না পেলেও কল্পনায় ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে। রাতুলের মুখে রক্তশূন্যতা। ওর চোখে কষ্টের মেঘ। ও যেন দম নিতে পারছে না। রাতুলের জন্য একটু মায়া হলো সৈকতের। ও বললো,

‘হ্যালো, রাতুল, শুনছেন..?”

এর কোন জবাব পেল না সৈকত। রাতুল ফোনে আছে এটা বুঝতে পারলো। ও আবার বললো,

‘রাতুল, আপনি কি আমার কথা শুনছেন?’

‘হ্যাঁ, শুনছি। বলুন।’

‘আপনি কেন সিডনী যাচ্ছেন না? রায়না আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।’

‘কিন্তু!’
‘কিন্তু কি?’
‘আপনি রায়নার কি হোন? আমার সেলফোন নম্বর পেলেন কী করে?’
জানতে চাইলো রাতুল। জবাবে সৈকত বললো,
‘আমি রায়নার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আর আপনার সেলফোন নম্বর সংগ্রহ করা কি খুব কঠিন? অন্ততঃ আমার কাছে কোন কাজই কঠিন নয়।’
কথাটি বলে ফেলে নিজের ভেতর এক ধরনের অহংকার টের পেল সৈকত। ও ফের বললো,
‘রাতুল, আপনার সমস্যাটি কী, বলুন তো? রায়না আপনার জন্য মরতে বসেছে, আর আপনি ঢাকা শহরে দিব্বি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ব্যাপারটা কি?’
এর জবাবে কিছু বললো না রাতুল। তবে ফোনের লাইনে আছে। সৈকত বললো,
‘কথা বলুন, রাতুল। চুপ করে থাকবেন না, প্লিজ!’
‘কী বলবো।’
‘কেন সিডনী যাচ্ছেন না? কেন রায়নার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন?’
‘আমার বলার কিছু নেই যে! রায়নার কাছে ফিরে যাবার পথও আমার নেই, সৈকত ভাই।’
‘ঠিক বুঝলাম না।’
এবারও চুপ করে রইলো রাতুল। সৈকত বললো,
‘আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, রাতুল। সময় দেবেন?’
‘দেখা হলে কী হবে?’
‘অন্তত দুজনের বসে আপনাদের সমস্যার কথা শুনবো। কেন রায়নার কাছে ফিরে যাচ্ছেন না, এই প্রশ্নের জবাব জানাটা খুবই জরুরি।’
‘এটা তো ফোনেও বলতে পারি।’
‘ফোনেও বলুন। তারপরও আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কখন সময় দিতে পারবেন, বলুন।’
আবারও চুপ করে রইলো রাতুল। সৈকত হতাশ হলো না। ওর মনে হচ্ছে, রাতুল দেখা করবে। যে কারণেই রাতুল রায়নার কাছে ফিরে না যাক, ওর প্রতি যে বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে-এটা সৈকত বুঝতে পারছে। সৈকত রাতুলের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে এক ধরনের থ্রিল উপভোগ করছে। ও বললো,
‘আপনি আমার কথা শুনেছেন?’
‘হ্যাঁ, শুনেছি।’
‘তাহলে সময় দিন, প্লিজ! ভয়ের কিছু নেই। আমি আপনার সমস্যার কথাও শুনতে চাচ্ছি।’
‘না, মানে..। ঠিক আছে।’
‘তাহলে বলুন, কোথায় এবং কখন আমাদের দেখা হচ্ছে। সম্ভব হলে আজই সময় দিন।’
‘ঠিক আছে রাত আটটায় চলে আসুন হোটেল শ্যারাটনের লবিতে। সুইমিং পুলের পাশে যে কোন একটি টেবিলে আমি থাকবো।’

‘আপনাকে আমি চিনবো কীভাবে?’
‘আমার টেবিলে ‘রাতুল’ নাম লেখা একটি ডেস্ক সাইনবোর্ড থাকবে।’
‘গুড! তাহলে দেখা হচ্ছে আজই।’
‘হ্যাঁ। তবে একটা প্রশ্ন।’
‘বলুন।’
‘রায়না ঢাকায় আসেনি তো?’
রাতুলের কণ্ঠ ভয়ার্ত মনে হলো। সৈকত ছোট্ট করে হেসে বললো,
‘ভয় নেই। রায়না ঢাকায় আসেনি। তাহলে আজ রাতেই দেখা হচ্ছে?’
‘হ্যাঁ, হচ্ছে।’
‘প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন তো?’
‘কথা দিচ্ছি থাকবো। আপনি আসুন। সাক্ষাতে কথা হবে।’
বললো রাতুল। সৈকতের ভেতর থেকে যেন একটা পাথর যেন নেমে গেল। ও বললো,
‘ঠিক আছে, তাহলে রাখছি।’
‘আচ্ছা।’
সৈকত ফোনের লাইন কেটে দিল। ওর মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। এতো সহজে রাতুলকে বের করে ফেলবো, ও কখনো ভাবেনি। সৈকত ঠিক করে নিল ও এখুনি ফোন করবে অহনাকে। সবার আগে অহনাকে এই খবরটা জানানো দরকার। অহনা নিশ্চয় অবাক হবে। সৈকতের মেজাজটা ফুরফুরে হয়ে গেল। ও ফোন করলো অহনার সেলফোনে। ও প্রান্তে তিনবার রিং হতেই অহনা ফোন ধরলো।
‘হ্যালো, বলুন।’
‘কেমন আছেন?’
‘মন্দ নয়। আপনি?’
‘আমি এই মুহর্তে ভীষণ আনন্দের জোয়ারে ভাসছি।’
‘কেন?’ কী অমন হলো বাংলাদেশে? আপনার প্রিয় কোন নেতা কি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছেন?’
‘তারচেয়েও বেশি আনন্দের সংবাদ আছে। তার আগে বলুন, আপনি কী করছিলেন?’
‘আমি বাইরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।’
‘কোথায় যাচ্ছেন?’
‘ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে একটু ঘুরে বেড়াবো।’
‘আমাকে সঙ্গে নেবেন না?’
জানতে চাইলো সৈকত। অহনা বললো,
‘আপনার কথা প্রথমে ভেবেছিলাম। পরে ভাবলাম, আপনি আবার কখন আমাকে একা ফেলে রেখে কোথায় চলে যাবেন, কে জানে!’

সৈকত বুঝতে পারলো দু'দিন আগে শাহবাগের ঘটনার কথা। অহনা দেরীতে এসে পৌঁছুলেও ও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল পাবলিক লাইব্রেরীর প্রধান ফটকের সামনে। সৈকত তখন ছিল কেয়ার গাড়িতে। ওর সেলফোন বন্ধ ছিল। বিষয়টি অহনাকে বিব্রত করেছে। এরজন্য পরে ফোন করে সৈকত অহনার কাছে ক্ষমাও চেয়েছে। অহনা তেমন কিছু বলেনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, অহনার রাগ উবে যায়নি। সৈকত বিনীতকণ্ঠে বললো,

'সেদিনের ঘটনার জন্য আমি সত্যিই লজ্জিত। খুবই দুঃখিত।'

'ঠিক আছে, আর দুঃখ প্রকাশ করতে হবে না।'

'আমার প্রতি আপনার রাগ এখনো যায়নি বুঝি?'

'আপনার উপর রেগে থাকার আমার কি অধিকার আছে?'

প্রশ্নটি যেন হঠাৎ করে একটি দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ওদের মধ্যে যে সম্পর্কটি তৈরি হয়েছে, এর নাম না থাকলেও এই প্রশ্নটি এখন ওদের সম্পর্কের মধ্যে কাঁটা বিঁধিয়ে দিল। সৈকত একটু বিব্রত হলো। ও হতাশার দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো,

'যে কুড়ি পাপড়ি মেলে ফুল হয়ে ফুটতে চায়, সে কখনো ফোটার অধিকার নিয়ে ফোটেনা। কুড়ির ফুল হয়ে ফোটার চলমান প্রক্রিয়াটিই একটি গ্রহণযোগ্য অধিকার। মানুষের মধ্যেও এমন কিছু অধিকার জন্ম নেয়, যা চলমান প্রক্রিয়ার মতই স্বাভাবিক। এই অধিকার ঘোষণা দিয়ে হয়না। আবার এই ধরনের প্রক্রিয়া বা অধিকার প্রতিষ্ঠার সহজাত উচ্ছ্বাসকে বাধা দেয়ারও কিছু নেই। নিয়তি, প্রকৃতি কিংবা নিজের ভেতরের সত্তার অপার্থিব নির্দেশে যা ঘটার কথা, তার জন্য অনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন আছে কি? আপনি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন, আমাদের সম্পর্কটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এরমধ্যে দুজনের প্রতি দু'জনার এক ধরনের অধিকার জন্ম নিয়েছে। জন্ম নেয়নি কি?'

এ কথা বলে সৈকতের মনে হলো ও কথার পাহাড় নাড়িয়ে দিয়েছে। ওর নিজেকে হালকা লাগছে। কথাগুলো বলে ভাবের গভীরতায় তলিয়ে যেতে লাগলো ও। অহনা কিছুক্ষণ কথা বললো না। একটু সময় নিয়ে ও বললো,

'শুনেছি, আপনি ফার্মাসীর ছাত্র। এখন তো মনে হচ্ছে সাহিত্য, যুক্তি বা মনবিজ্ঞান পড়লে ভালো করতেন।'

এর জবাবে কিছু বললো না সৈকত। অহনার এক ঝলক হাসির শব্দ শুনতে পেল সৈকত। ওর মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। অহনা ফের বললো,

'আপনি কি রেগে গেছেন?'

'আপনার প্রতি আমার রাগ বা অনুরাগ জন্ম নিলে এর অধিকারও আমার নিজের ভেতর সপ্রণোদিতভাবে তৈরি হবে। আমি এর জন্য আপনার অনুমতি চাইবো না।'

'ঠিক আছে, কথাটি মনে থাকবে। এখন একটু শান্ত হোন।'

সৈকত শান্ত হয়ে এলো। ও প্রান্ত থেকে অহনার প্রশ্ন ভেসে এলো,

'আপনি এখনো বলেননি আনন্দের সংবাদটি কী?'

'এ কথা শুনলে আপনিও ভীষণ আনন্দিত হবেন।'

‘তাহলে বলছেন না কেন? আনন্দের সংবাদ না দিয়ে সকাল-সকাল ঝগড়া করলেন আমার সঙ্গে!’
এ কথায় মৃদু হাসলো সৈকত। ও বললো,
‘রাতুলকে পেয়েছি।’
‘কী বললেন!’
‘রাতুলের সন্ধান পাওয়া গেছে।’
‘সত্যি!’
‘হ্যাঁ, সত্যি।’
‘আপনি সত্যিই জিনিয়াস!’
‘ধন্যবাদ।’
‘সে কোথায়? কীভাবে দেখা করতে পারি?’
অহনার কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা। সৈকত বললো,
‘আহা উত্তেজিত হবেন না। শান্ত হোন, বলছি।’
‘বলুন। তার সঙ্গে কবে দেখা করতে পারি?’
‘আজই দেখা করবো আমরা।’
‘রিয়েলি! তার সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার?’
‘হুম্। এই কিছুক্ষণ আগে রাতুলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি।’
‘বলেন কি! এক্সসিলেন্ট! আপনি গ্রেট!’
‘আপনি বেশি প্রশংসা করে ফেলছেন। যাকগে, আপনি কি রাতুলের সঙ্গে দেখা করতে চান?’
‘অবশ্যই।’
‘তাহলে সন্ধ্যায় তৈরি থাকবেন।’
‘রাতুল কি আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলেছে।’
‘হ্যাঁ, সে রাজী হয়েছে। সময়ও দিয়েছে।’
‘কোথায় দেখা করবেন?’
‘হোটেল শেরাটনের লবিতে ও থাকবে। রাত আটটায় ও থাকবে সুইমং পুলের পাশের একটি টেবিলে। ওর টেবিলে রাতুল নামের একটি ডেস্ক সাইনবোর্ড থাকবে।’
‘বাহ! চমৎকার আয়োজন।’
‘আপনি খুশি হয়েছেন?’
‘আপনার কাজে আমি মুগ্ধ।’
‘তাহলে আমরা যাচ্ছি শেরাটনে।’
সৈকতের এ কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলো অহনা। ও হয়তো কিছু ভাবছে। সৈকত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফের বললো,
‘কী ভাবছেন?’

‘ভাবছি, ওখানে আমি একা গেলে কেমন হয়?’
‘একা যাবেন? কেন?’
‘আপনাকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে কি মাইন্ড করবেন?’
‘না, না। মাইন্ড করার কী আছে। তবে..।’
‘নিরাপত্তার কথা বলবেন তো?’
‘হ্যাঁ, সমস্যাও তো হতে পারে।’
‘শেরাটন বলেই ওখানে আমি একা যেতে চাচ্ছি।’
‘ঠিক আছে। রাত আটটায় আপনি চলে যাবেন শেরাটনে।’
কথাটি বলতে গিয়ে চুপসে গেল সৈকত। ওর মন খারাপ হয়ে গেল। কেন ওর মন খারাপ হলো ও বুঝতে পারছে না। রাতুলকে খুঁজে বের করাটাই ছিল ওর কাজ। ওর দায়িত্ব শেষ। এখন অহনা ওকে সঙ্গে নিচ্ছে না বলে ও বিষন্ন হয়ে গেল। অনেক সময় অনেককে গ্রাস করে অযাচিত বিষন্নতা। সৈকত এই মুহুর্তে আযাচিত বিষন্নতায় ডুবে যেতে লাগলো। ফোনের ও প্রান্ত থেকে অহনা ‘হ্যালো, হ্যালো’ বলছে। অহনার কথা সৈকত যেন শুনতে পাচ্ছে না। এক সময় ফোনের লাইনটা কেটে গেল।

নয়
অহনার আচরণে ভীষণ অবাক হলো সৈকত। ও ভেবেছিল অহনা ওকে ফোন করে জানাবে, রাতুলের সঙ্গে দেখা হলো কিনা। কিংবা রাতুলের সঙ্গে দেখা হবার পর কী আলোচনা হলো। রাতুল অষ্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাচ্ছে কিনা। যদিও এসব অহনাদের পারিবারিক ব্যাপার, তারপরও সৈকত এই ঘটনার সঙ্গে অনেকটাই জড়িয়ে গেছে। সৈকতের এ বিষয়ে কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু অহনা ফোন করে সৈকতকে কিছু জানায়নি। মধ্যরাত অব্দি ও অহনার ফোনের অপেক্ষা করেছে। রাত পেরিয়ে গেল, কিন্তু অহনার ফোন এলো না। অহনার কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ আশা করেনি ও। সৈকত কি খুব বেশি আশা করে ফেলেছে? সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই নিজে নিজে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজছে ও। ঘুম ভাঙার পর থেকে ও অস্বস্থিতে রয়েছে। প্রথমে ভেবেছিল, অহনাকে ও নিজে ফোন করে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু অহনার প্রতি ওর অভিমান জমে গেল। এই অভিমানে চাপা রাগের রঙ তেতে উঠছে। এই অনাহুত অভিমান ওকে কষ্ট দিচ্ছে। সৈকত নিজের বিছানায় শুয়ে এ পাশ ও পাশ করছিলো। এ সময় সুমনের ফোন এলো। ও ফোন ধরলো।
‘হ্যালো।’
‘সৈকত? কেমন আছিস?’
‘ভালো। তুই?’
‘আমি আগের মতই ব্যস্ত।’
‘তো কী খবর? অনেকদিন পর ফোন করলি।’
‘হ্যাঁ, প্রথমে তোকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

‘কেন?’
‘রাতুলকে খুঁজে বের করতে পেরেছিস বলে।’
‘ও আচ্ছা। ওয়েলকাম।’
‘দোস্ত, তুই আসলে জিনিয়াস!’
‘হয়েছে, হয়েছে। তেল মারছিস কেন?’
‘না, না, তেল নয়। তুই মনে হচ্ছে কেমন চুপসে আছিস? মুড ভালো নেই?’
‘না, তা নয়। ঘুম ভেঙেছে মাত্র। শুয়ে এ পাশ ওপাশ করছি।’
‘তা শোন, তুই কি আজ একবার আমার অফিসে আসতে পারবি?
‘কেন?’
‘বাহ্ রে! পাঁচ লাখ টাকার চেক নিবি না? তোর কাজ তো শেষ।’
‘ও আচ্ছা।’
‘এতো ‘ও আচ্ছা’ করছিস কেন? তোকে আজ কেমন বিষন্ন লাগছে বন্ধু। কী ব্যাপার?’
এর জবাবে কিছু বললো না সৈকত। ফোনের ও প্রান্ত থেকে সুমন ফের বললো,
‘অহনার সঙ্গে তোর কোন মন-মালিন্য হয়েছে?’
‘কেন এই প্রশ্ন করছিস?’
‘না, অহনাকে দেখে এলাম বিষন্ন। ও কাল রাত থেকে একেবারেই চুপসে গেছে।’
এ কথা শুনে কোথাও যেন বরফ গলতে শুরু করলো। সৈকত একটু বিচলিত হলো। ও প্রশ্ন করলো,
‘কেন এখন তো ওর মন ভালো থাকার কথা। রাতুলের সন্ধান পেয়ে গেছে।’
‘সন্ধান পেলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? সমস্যা তো আরো বাড়তেও পারে।’
‘ঠিক বুঝলাম না।’
‘তোকে কিছু বলেনি অহনা?’
এই প্রশ্নে বিব্রতবোধ করলো সৈকত। ও কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললো,
‘দোস্ত, অহনাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ওর মধ্যে গভীর রহস্য রয়েছে।’
এ কথায় ও প্রান্তে হাসতে লাগলো সুমন। সৈকত সঙ্কোচ বোধ করলো না। সুমনের সঙ্গে সম্পর্কটা এমনই। ওরা কথা বলে অকপটে, নিঃসঙ্কোচে। হাসি থামিয়ে সুমন বললো,
‘যাক তুই যদি এই রহস্য উদঘাটনে নেমে পড়িস, আমার কোন আপত্তি নেই। চেষ্টা করে দেখ।’
এ কথায় স্বস্থি পেল সৈকত। ও বললো,
‘তোন কাজিন কি আমাকে সে সুযোগ দেবে? ও ভীষণ মুডি?’
‘এটা তোর আর ওর ব্যাপার।’
‘তা বুঝলালম, কিন্তু অহনা আমাকে কাল রাত থেকে ফোন করেনি।’
‘ঠিক আছে, তুই ফোন কর। আর হ্যাঁ, অফিসে এসে পাঁচ লাখ টাকার চেক নিয়ে যাস।’
‘না। টাকা আমি নেব না।’

‘কেন?’
‘এতো ছোট একটা কাজের জন্য এতো টাকা নেয়া যায় না। তাছাড়া আমি ভেবে রেখেছিলাম কাজটি করার পর টাকা নেব না।’
টেলিফোনের ও প্রান্তে সুমনের মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেল সৈকত। ও বললো,
‘আমি সিরিয়াস, টাকা নিচ্ছি না।’
‘এই টাকা তাহলে অহনাকে ফিরিয়ে দেব?’
‘হ্যাঁ, ফিরিয়ে দে।’
‘ঠিক আছে। তবু তুই দুপুরে অফিসে আসিস। আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করবো।’
‘আচ্ছা, আসবো।’
‘তাহলে দেখা হচ্ছে, দুপুরে।’
‘হ্যাঁ। একটা প্রশ্নের জবাব দিবি? প্রশ্নটা করছি নিজের কৌতুহল বশত।’
‘কী প্রশ্ন, বল।’
‘রাতুল অহনাকে কী বলেছে?’
এই প্রশ্নে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সুমন। সৈকত অপেক্ষা করছে। এক সময় সুমন বললো,
‘খুব সংক্ষেপে বলছি। রাতুল এখানে বিয়ে করে ফেলেছে। রাতুল অহনাকে জানিয়েছে ও পরিবারের চাপে পড়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। এ কারণে ও নাকি সিডিনীতে ফিরে যায়নি। নিজের অসহায়ত্বের কথা জানিয়ে রায়নাকে কষ্ট দেবার জন্য অহনার কাছে ক্ষমা চেয়েছে রাতুল।’
‘বলিস কি!’
‘হ্যাঁ। অহনার খুব মন খারাপ। হয়তো এ কারণে ও তোকে ফোন করেনি। তুই ওকে ফোন কর। আর হ্যাঁ, রাতুলের কথা আপাতত জিজ্ঞেস করিস নে। গল্প করতে পারিস। এতে ওর মন হালকা হতে পারে।’
সৈকতের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। অহনার প্রতি জিইয়ে থাকা অভিমান বা রাগ মিলিয়ে গেল। সুমন প্রান্ত থেকে বললো,
‘ফোন রাখছি, কেমন? তুই কথা বলে নিস্ অহনার সঙ্গে।’
‘আচ্ছা।’
সুমন ফোন লাইন কেটে দিল। সৈকতের ভাবতে লাগলো অভিমান ভুলে অহনাকে একটা ফোন করলে কেমন হয়। এমন কি হয়েছে যে, অহনা চুপসে গেছে? কেন ওকে ফোন করেনি? অহনা কি আরো জটিল কোন সমস্যায় পড়ে গেছে? এ কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ও ফোন করলো অহনার সেলফোনে। অহনা ফোন ধরে বললো,
‘হ্যালো।’
অহনা কণ্ঠে যেন হেমন্তের মেঘ জমে আছে। কেমন ভেজা ভেজা। সৈকত নরম গলায় বললো,
‘কেমন আছেন?’

অহনা এর জবাবে কিছু বললো না। ও চুপ করে রইলো। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে সৈকত ফের বললো,
‘আমি আশা করেছিলাম আপনি আমাকে ফোন করবেন। আমি নিজেই ফোন করলাম, কিন্তু আপনি কথা বলছেন না। আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন না?’
‘না, ঠিক তা নয়।’
‘তাহলে?’
‘আমার মনটা ভালো নেই। আই মীন আই এম ব্রোকেন।’
‘হোয়াই? এনি থিংস রঙ?’
এ প্রশ্নের জবাব দিল না অহনা। সৈকত বললো,
‘অহনা, আমি রাতুলের ব্যাপারে কৌতুহল দেখাতে চাইনা। আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিগত কৌতুহল দেখানোর ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে।’
‘বলুন।’
সৈকত এবার কয়েকমুহুর্ত ভাবলো। অহনা নিশ্চয় দু’একদিনের মধ্যে চলে যাবে। অহনার মনের অবস্থা জেনে নিতে চায় সৈকত। ও ‘অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত’ প্রশ্ন করলো,
‘অহনা আপনি কি অষ্ট্রেলিয়াতেই সেটেলড্ হতে চান? নাকি প্রয়োজনে বাংলাদেশে থাকতে রাজী হবেন?’
‘কেন এই প্রশ্ন করছেন?’
‘না, জানতে চাচ্ছি, আপনাদের মত মেধাবী যারা আছেন, তারা যদি দেশে থাকেন, তাহলে দেশের জন্য মঙ্গলজনক।’
‘যদি থাকতে চাই, তাহলে আমাকে কী করতে হবে?’
‘এ দেশের সন্তান এমন কোন যোগ্য ছেলেকে আপনি বিয়ে করতে পারেন।’
খুব সাহস করেই কথাটি বলে ফেললো সৈকত। অহনা কিছু বললো না। কয়েকমুহুর্ত অপেক্ষার পর সৈকত বললো,
‘এই প্রশ্ন শুনে আপনি কি রাগ করলেন?’
‘না, রাগ করিনি। তবে ভাবছি, আপনি ঘটকালীও করেন কিনা।’
‘এখনো করিনি। তবে আপনার জন্য আমি এই কাজটি করতে রাজী আছি।’
‘আমার প্রতি আপনার এই বিশেষ টান কেন?’
এই প্রশ্নের জবাবে কী বলবে, সৈকত ঠিক করতে পারলো না। এতো সহজেই যে, এই প্রশ্নটা এসে যাবে, ও বুঝতে পারেনি। ও একটু এলোমেলো চিন্তার মধ্য দিয়ে বললো,
‘আসলে আমি চাই না, আপনি অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। আপনার মধ্য বাংলাদেশের কোমল সৌন্দর্য দেখতে পাই আমি।’
‘তাই নাকি? আর কি কি দেখতে পান আপনি?’
অহনার প্রশ্নে সৈকত বললো,

‘আপনার কথায় তের শ’ নদীর ঢেউ দুলে ওঠে। আপনার হাসিতে জ্যোস্নার লাবণ্য ঝরে পরে। আপনার চোখে ছয় ঋতুর বর্ণিল বৈচিত্রতা দেখতে পাই। আপনার সান্নিধ্যে নিবিড় মমতার স্পর্শ পাই।’

সৈকত কথাগুলো বললো এক ধরনের তন্ময়তায়। ও প্রান্তে অহনা কী ভাবছে, জানে না ও। অহনা যাই ভাবুক, যেভাবেই এই কথাগুলো নিক, সৈকত এ নিয়ে চিন্তিত নয়। সময় মত নিজেকে প্রকাশ করতে না পারলে অহনার হৃদয়ে করাঘাত করার সুযোগ ও আর পাবে কি? অহনা বেশ কিছুক্ষণ এর কোন জবাব দিল না। সৈকত হতাশ না হয়ে ফোনের লাইনে চুপ করে রইলো। এক সময় অহনার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,

‘সৈকত, আপনি সবকিছুতে সহজেই মুগ্ধ হয়ে যান’।

‘মানে?’

‘আপনি কি জানেন, চট করে মুগ্ধ হয়ে যাওয়ায় ভয় আছে।’

‘কিসের ভয়?’

‘হারানোর ভয়’।

‘ঠিক বুঝলাম না।’

নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করলো সৈকত। অহনা বললো,

‘মুগ্ধতা ভালো। এটা সহজাত। আবেগের হালাকা প্রলেপের মত। কিন্তু গভীর মুগ্ধতা চরিত্রের দুর্বল দিক। ব্যক্তিত্বকে হালকা করে তোলে। তা ছাড়া এতে সংশয়ও থেকে যায়।’

এ পর্যন্ত বলে থামলো অহনা। বিব্রত কণ্ঠে সৈকত বললো,

‘থামলেন কেন, বলুন।’

অহনা বললো,

‘পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ হবার অসংখ্য বস্তু আছে, মানুষও আছে। মুগ্ধ হতে পারেন, কিন্তু জমে যাওয়া ঠিক নয়। ঐ মুগ্ধতাকে নিজের ভেতরের শুদ্ধতা দিয়ে, পবিত্র অনুভূতি দিয়ে উপভোগ করুন, ঠিক আছে। কিন্তু নিজেকে বিচ্যুত করলে পথভ্রষ্ট হবার আশংকা বেশি। অপরকেও ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারেন।’

অহনার কথায় হোচট খেল সৈকত। অহনার চমৎকার বাংলা বলা ওর ভালো লাগে। তারওপর এমন ব্যাখ্যা কার না ভালো লাগবে। কিন্তু অহনার কথাগুলো কি মেনে নেয়া যায়? সৈকত বললো,

‘আধুনিক জীবন যাপনে চট করে মুগ্ধ হবার প্রতিযোগিতাই নাকি বেশি? এ নিয়েই তো মেতে আছে পশ্চিমারা। তাইনা?’

জবাবে অহনা বললো,

‘এটা আধুনিকতার নামে কপটতা। তা ছাড়া তর্কের খাতিরে এটাকে যদি আধুনিকতা ধরেও নিই, আমি এই আধুনিকতার সমর্থক নই। আমি কথা বলছি, নান্দনিকতার। আধুনিকতা আর নান্দনিকতা এক নয়।’

সৈকত একটু চিন্তা করে বললো,

‘আমি কি নান্দনিকতার পক্ষের লোক নই? রাজনীতি করি বলে কি আমরা নান্দনিকতাকে বিসর্জন দিয়েছি?’
‘আমি কিন্তু তা বলিনি? আপনার সম্পর্কে আমার ধারনা ও রকম নয়। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, এক পলকে মুগ্ধ না হয়ে অপেক্ষা করুন। অনুধাবন করুন। নিজেকে আরো ভালো করে প্রস্তুত করুন। এরপর এক্সপ্রোজ করুন দৃঢ়চিত্তে, নিঃসঙ্কোচে। যা হাত বাড়িয়ে ধরতে চান, আগে দেখুন সে মরীচিকা কিনা!’
এরপর কী বলা যায়? সৈকত আরো বিব্রতবোধ করতে লাগলো। অহনার সঙ্গে কথায় হেরে যেতে হচ্ছে। ও বললো,
‘আসলে কি, আমার নিজের পছন্দের প্রতি নিজের অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে। তাই আমি যাকে পছন্দ করি, তা মরীচিকা হতে পারে না-এটাই আমার বিশ্বাস। নিজের পছন্দ নিয়ে নিজের বিশ্বাসে আমি দ্বিধা বা সংশয় ছড়াতে চাইনা। আপনি আমাকে সেদিকে নিয়ে যাবেন না, প্লিজ!’
অহনা এর কোন জবাব দিল না। সৈকতের মনে হচ্ছে ও যেন অহনার হৃৎপিন্ডের ‘ধুক ধুক’ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। অহনা কি ভেঙে পড়ছে? অহনা নামক এক অনড় পাহাড় কি ভেঙে নদী হয়ে ধেয়ে আসছে সৈকতের দিকে? সৈকত কি ভেসে যেতে পারে না অহনা নদীর ফল্গুধারায়? এই মুহুর্তে এই প্রশ্নটাই রঙধনুর মত জ্বলজ্বল করছে সৈকতের আবেগ ভেজা মনের আকাশে। সৈকত ও অহনা কেউ আর কোন কথা বললো না। ওরা কথা না বললেও কেউ ফোনের লাইন কাটছে না। মৌনতার সূঁতোয় কে যেন বুনে যাচ্ছিলো বিমূর্ত মুহুর্তগুলো। কিছুক্ষণ পর অহনা ফোনের লাইন কেটে দিল। সৈকতের মন খারাপ হল না। ও অদ্ভূত স্বপ্নঘোরে ডুবে গেল।

দশ

অনেকদিন পর কেয়া ফোন করলো। যদিও কেয়াকে নিয়ে সৈকতের আবেগ মথিত স্বপ্ন নেই, তবু একেবারে যে ওকে নিয়ে ওর মনে আবেগ মাঝেমাঝে তৈরি হয়না-তা নয়। অবচেতন মনে কেয়ার প্রতি বিবর্ণ হয়ে যাওয়া অনুরাগ মাঝেমাঝে ভেসে ওঠে। সৈকত এই অনুরাগকে প্রশ্রয় দেয়না। তবে কিছুদিন আগেও এই অনুরাগের প্রশ্রয় ছিল। অহনার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে সৈকত কেয়া ও ওর মাঝখানে বিশাল দূরত্ব আবিস্কার করে। সৈকতের উপলব্ধিতে আসে, কেয়ার সঙ্গে অনুরাগের যে গোপন সম্পর্কটা তৈরি করেছে,তা কখনোই কোন পরিণতির দিকে যাবে না। পরিণতিহীন কিংবা গন্তব্যহীন পিচ্ছিল পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া সময়ের অপচয় ছাড়া আর কি? এই প্রশ্নটা সৈকতকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। অহনার সঙ্গে পরিচয় হবার আগ পর্যন্ত গোপন অনুরাগের পথে হাঁটতে ছিল ও। অহনা হঠাৎ ঝড়ের মত এসে সৈকতের সম্বিত ফিরিয়ে দিয়েছে। কেয়ার ফোনটি একটু সময় নিয়ে রিসিভ করতে করতে এ কথাগুলো ভাবলো সৈকত। ফোনে কেয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,
‘হ্যালো, সৈকত তুমি কোথায়?’

কেয়ার কণ্ঠস্বর যেন কেমন মনে হল। সৈকত বললো,
‘আমি ধানমন্ডিতে। কেন?’
‘তুমি কি কোন গোপন মিটিংয়ে যাচ্ছো?’
এই প্রশ্ন শুনে অবাক হল সৈকত। ও সত্যিই একটি গোপন মিটিংয়ে যাচ্ছে। ফজলুল হক ভাই ডেকেছেন। ধানমন্ডির ঝিকাতলায় একটি বাড়ির ঠিকানা দিয়ে তিনি ওকে আসতে বলেছেন। রাজনৈতিক কারণে এই মিটিংটি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ঢাকা নগরীতে রাজনৈতিক কর্মসূচির উপর থেকে নিষোধাজ্ঞা প্রত্যহার করেছে সরকার, তবু রাজনৈতিক সভা বা বৈঠক খুব একটা হচ্ছে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোতে নেতৃত্ব শূন্যতা এবং আভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকট। বেশ জোরালোভাবে বইছে সংস্কারের হাওয়া। সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থার গোয়েন্দারা সতর্কতার সঙ্গে ওয়াচ করছে প্রায় প্রতিটি দলের নেতাদের কর্মকান্ড। এমনি অবস্থায় ফজলুল হক ভাইয়ের গোপন মিটিংয়ের ডাক কৌতুহলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণও কম নয়। গোপন মিটিংয়ের কথা শুনে প্রথমে চমকে গিয়েছিল সৈকত। ফজলুল হক ভাই আগেই ওকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন। হয়তো এই মিটিং থেকে কোন দিক নির্দেশনা আসতে পারে। সৈকত এই গোপন মিটিংয়ের কথা কাউকে বলেনি। কিন্তু কেয়া কী করে এই মিটিংয়ের কথা জানলো? সৈকতের মনে এই প্রশ্নটা বিস্ময় ছড়িয়ে দিল। টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে কেয়া বললো,
‘তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?’
‘হ্যাঁ। কিন্তু..!’
‘আমি জানি, তুমি জানতে চাইবে তোমাদের গোপন মিটিংয়ের কথা আমি কী করে জানলাম।’
‘হ্যাঁ, তুমি কী করে জানলে?’
‘সেটা পরে বলবো। এখন আমার কথা শোন, তুমি ঐ মিটিংয়ে যেয়ো না, প্লিজ!’
‘কেনো?’
‘তোমার বিপদ হতে পারো।’
এ কথায় না হেসে পারলো না সৈকত। ও বললো,
‘শোন, আমার ওপর নজরদারি করাটা ছেড়ে দাও। আমি বিরক্ত হচ্ছি। কেয়া, তুমি দিনদিন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছো!’
‘যা ইচ্ছা বলতে পারো। তবে অনুরোধ করছি, তুমি ঐ মিটিংয়ে যেয়ো না। আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।’
‘যে বাড়িতে মিটিংটা চলছে, আমি কিন্তু ঐ বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখান থেকে কেন ফিরে যাবো? আর মিটিংয়ে যাবোই না কেন?’
এর জবাবে কেয়া একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,
‘আমি জানি, তোমাকে ফেরানো যাবে না। তবু অনুরোধ করে রাখলাম। তুমি বোকা, তোমার রাজনীতি মানায় না। তুমি যেয়ো না, তোমার বিপদ হতে পারে! ’

‘তুমি বিপদের কথা বলছো কেন? কী হতে পারে আমার? আমি কী এমন কাজ করেছি যে, আমার বিপদ হতে পারে?’
‘এর জবাব আমার কাছে নেই। তবে এখন তো অন্যরকম পরিবেশে। কখন কে বিপদে পড়ে যাবে, কে জানে। আমি আভাস পেয়েছি গোয়েন্দাদের ওয়াচের তালিকায় তোমার নাম আছে।’
আবার হাসলো সৈকত। ও বললো,
‘গোয়েন্দাদের তালিকায় আমার নাম তুমি উঠিয়েছো? নাকি তোমার বিত্তশালী হাজব্যান্ড উঠিয়েছেন?’
এর জবাব না দিয়ে কয়েকমুহূর্ত চুপ থেকে কেয়া বললো,
‘তাহলে তুমি ঐ মিটিংয়ে যাচ্ছো?’
‘অবশ্যই। বিপদ হলেও যাবো। আমি পেছন থেকে পালাতে শিখিনি।’
এ কথা সৈকত বললো অনেক জোর দিয়ে। ও প্রান্তে কেয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। সৈকত বললো,
‘তুমি কি আর কিছু বলবে? এমনিতেই আমার অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি আর সময় নষ্ট না করে মিটিংয়ে যেতে চাই।’
‘মিটিংয়ে যাবেই?’
‘আশ্চার্য! যাবো না কেন?’
‘তুমি কি জানো, তোমার অহনা আজ অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে?’
এ কথাটি সৈকতের কাছে বজ্রঘাতের মত লাগলো। ও বিস্মিত না হয়ে পারলো না। অহনা যদি আজ অস্ট্রেলিয়া সত্যিই চলে যাবে, তাহলে ও জানবে না কেন? অহনা বা সুমন ওকে কি এ কথা জানাবে না? কিন্তু কেয়ার কথাও অবিশ্বাস করা ঠিক হবে না। গোপন মিটিংয়ের কথা যখন ও জানতে পেরেছে, অহনার খোঁজ-খবরও ও নিশ্চয় রাখছে। সৈকত বিব্রতকণ্ঠে বললো,
‘তুমি কি বললে?’
‘বললাম, অহনা আজ চলে যাচ্ছে। আমি জানি, তুমি এই খবরটা জানো না।’
‘অহনা চলে গেলে আমার কী?’
সৈকত এ কথা বললেও মনে মনে কষ্ট টের পাচ্ছে। ও প্রান্তে কেয়া কি হাসছে? কেয়া বললো,
‘তোমার অনেক কিছু। তুমি নিশ্চয় অনেক কষ্ট পাবে।’
‘পেলে পাবো। এখন ফোন রাখছি।’
‘শোনো, শোনো। মিটিং না করে সোজা চলে যাও অহনার কাছে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কথাটি বলে ফেল। নইলে কিন্তু অহনাকে আর পাবে না!’
কেয়ার রিনরিনে হাসির শব্দ ভেসে আসছে। এটা কি সৈকতের প্রতি কেয়ার উপহাস, নাকি করুনা? সৈকত অস্বস্থিতে ফোনের লাইন কেটে দিল। এরপর ও প্রথমে ভাবলো অহনাকে

ফোন করবে, কিন্তু এই ভাবনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল পরক্ষণেই। অহনা যদি আজ অস্ট্রেলিয়ায় চলেই যাবে, ও কেন নিজে ফোন করে এই সংবাদ জানবে? সৈকতের মনে অভিমান জমতে লাগলো। অভিমানের কুয়াশা নিয়ে ও হনহন করে ঢুকে গেল মোতালেব হোসেনের বাড়ির প্রবেশ পথে। এই বাড়িতেই ওকে আসতে বলেছেন ফজলুল হক। বাড়ির দারোয়ান ওকে দেখেও না দেখার ভান করে রইলো। সৈকত বুঝতে পরলো মোতালেব হোসেনের বাড়িতে সভা চলছে। ও মোতালেব হোসেনের বাড়ির দরোজায় কড়া নাড়তেই দরোজাটা খুলে গেল। দরোজা খুললেন ফজলুল হক, যেন তিনি সৈকতের জন্য দরোজার ওপাশে অপেক্ষা করছিলেন।

'এসো, এসো। ভেতরে চলে এসো।'

রাশভারী গলায় বললেন ফজলুল হক। রুমের ভেতরে প্রবেশ করতেই ভীষণ চমকে ওঠলো সৈকত। মিটিংয়ে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও বামজোটের নেতারা রয়েছেন। এমন দৃশ্য দেখবে ও কল্পনাও করেনি। যে সকল নেতারা প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত বিষেদগার করে বক্তব্য দিয়ে এসেছেন, তারাই আজ এক হয়ে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এই গোপন মিটিংয়ের উদ্দেশ্য কি? তারা কি গোপনে সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন? সৈকতের মনে তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রশ্ন উঠলো। ও হচকিতভাবে তাকালো ফজলুল হকের মুখের দিকে। ওর চোখের দৃষ্টিতে 'এসব কী দেখছি!' এমন প্রশ্ন বুঝি ফুটে আছে। ফজলুল হক ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন,

'সৈকত, বসো। আমরা আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা করছি।'

সৈকত ওদের পার্টির ঢাকা মহানগরী শাখার এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতা নন। তাই ওর উপিস্থিতি নিয়ে অন্যান্য দলের নেতারা কৌতুহল দেখাচ্ছেন না। তবে সৈকত এই নেতাদের সামনে বিব্রতবোধ করতে লাগলো। ও ফজলুল হকের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় বললো,

'ফজলু ভাই, আপনার সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলতে চাই।'

'ঠিক আছে, পাশের রুমে চলো।'

ফজলুল হক পাশের রুমের দিকে পা বাড়ালেন। তাকে অনুসরণ করলো সৈকত। পাশের রুমে এসে ফজলুল হক দরোজাটা লক করে দিলেন। তিনি সৈকতের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'বলো, কী বলতে চাও?'

'ফজলু ভাই, আমি কী দেখছি এ সব! প্রায় সব দলের নেতারা কীভাবে এক হলেন? এক হলেনই বা কেন?'

'সৈকত, সে জন্যই তো তোমাকে আসতে বলেছি। তুমি কি কিছু আঁচ করতে পারছো না?'

'মনে হচ্ছে, সরকার বিরোধী কোন কর্মসূচি আসছে। এতো নেতাদের একসঙ্গে বসালেন কীভাবে?'

এ কথায় হো হো করে হেসে ফেললেন ফজলুল হক। সৈকত বোকার মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। হাসি থামিয়ে ফজলুল হক বললেন,
'তুমি যা ভাবছো, ঠিক এর উল্টোটি হচ্ছে এখানে।'
'ঠিক বুঝলাম না।'
'আমরা বর্তমান সরকারের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি।'
'কি বললেন!'
'আহা! অতো অবাক হচ্ছো কেন?'
'অবাক হবো না? এতোদিন যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছিলেন, এখন সেই দল ছেড়ে দেবেন?'
'এই দল আমাদের কী উপহার দিয়েছে, বলো তো? দুর্নীতি ছাড়া আমাদের কী আছে? দলের মধ্যে গণতন্ত্র আছে? সঠিক ও যোগ্য নেতার মূল্যায়ন আছে?'
কথাগুলো ফজলুল হক বললেন অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গে। সৈকত যেন তার মনে পুষে রাখা ক্ষোভকে উস্কে দিয়েছে। সৈকত বললো,
'আমরা একটি আদর্শকে সামনে নিয়ে রাজনীতি করছি না?'
'আদর্শ! রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে আদর্শের কিছু দেখেছো? গালভরা কথার ফুলঝুরি আর তোষামোদী ছাড়া আর কী এমন কাজ এ পর্যন্ত করেছেন তারা?'
'আপনার কথাও ঠিক। তবু..!'
'তবু কী?'
'বলতে চাচ্ছি, দল ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন? আই মীন, সরকারকে সমর্থন দিয়ে কী পাবেন?'
'সরকারকে সমর্থন দিতে চাই সরকারি দলের সুবিধাবাদী সমর্থক হবার জন্য নয়। এই সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে নজীরবিহিন অভিযান চালিয়েছে, এর পক্ষে থাকাটা সচেতন সকলের দায়িত্ব। এই সরকারকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করা উচিত নয়কি?'
'ফজলু ভাই, এটি একটি অনির্বাচিত সরকার!'
'তাতে কি! সরকার তো নির্বাচন দিচ্ছে। এই জন্যইতো সরকারের হাতকে শক্তিশালী করতে চাই। আগামী নির্বাচনে যাতে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা অংশ নেন এবং জয়লাভ করেন, এই লক্ষ্যে মাঠে নেমে পড়তে হবে আমাদের। এখন আর বসে থাকার সময় নেই, বুঝলে?'
'এই সরকার পরিচালিত হচ্ছে সেনাবাহিনী দ্বারা। তাহলে বলছেন, সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবে, আর আমরা এর সমর্থন দেব?'
'এতে সমস্যা কোথায়? তুমি কি জানো, দক্ষিণ কোরিয়াকে আজ যে উন্নয়নশীর দেশ হিসাবে দেখছো, এর নেপথ্য ভূমিকা রেখেছিলেন সেদেশের দুই জেনারেল। দক্ষিণ কোরিয়াতেও একসময় সীমাহীন দুর্নীতি ছিল। রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতার কারণে ওই দেশের সেনাবাহিনীর দুই জেনারেল দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে নেন। এরপর তারা দেশকে উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে নিয়ে যান। এখন তারা তাদের জাতির কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন।'

‘ফজলু ভাই, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আরোহণকে পছন্দ করেনা। দেখবেন, এক সময় গণরোষের শিকার হবে এই সরকার।’
‘সৈকত, তোমার এই ধারনা ভুল প্রমাণিত হবে। দুর্নীতির অতল গহ্বর থেকে দেশকে টেনে তুলতে হলে আমাদের সামনে অন্য কোন চয়েজ নেই। এখন কোনটি বড়, গণতান্ত্রিক পরিবেশে নাকি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ? তাছাড়া গণতান্ত্রিক পরিবেশ তো রক্ষা হচ্ছেই। নির্বাচন হবে, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নেবেন এবং তারা দেশকে উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাবেন-এটাই তো আমরা চাই। তাইনা?’
‘তা ঠিক। তারপরও কোন ভরসায় আমরা এই সেনা সমর্থিত সরকারের পক্ষে কাজ করবো?’
এ কথায় একটু ভাবলো ফজলুল হক। সৈকতের চিন্তা এলামেলো হয়ে আসছে যেন। ফজলুল হক বললেন,
‘ভরসা রাখতে হবে নিজের উপর। তুমি যদি দেশকে ভালোবাসো তবে সংস্কারের পক্ষে থাকো। দুর্নীতি প্রতিরোধ, সুস্থ রাজনীতির চর্চা আর উন্নয়নের ধারায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’
এ কথার সামনে কেমন চুপসে গেল সৈকত। ও বুঝতে পারছে না কী করবে। ফজলুল হক ভাইয়ের যুক্তিও খন্ডন করা যাচ্ছে না। কিন্তু ওর মন সায় দিচ্ছে না। ও বিব্রত বোধ করতে লাগলো। ফজলুল হক যেন ওর মনের কথা বুঝতে পারছেন। তিনি বললেন,
‘সৈকত, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসো না। যদি মনে করো, দেশের জন্য কিছু করতে চাও, তবে আমাদের সঙ্গে এসে হাতে হাত রাখো। আমি তোমার মনের উপর জোর খাটাতে চাই না। তবে বিশ্বাস করি, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।’
ফজলুল হকের এই কথার কোন জবাব দিল না সৈকত। ও মাথা নিচু করে রইলো। জীবনে অনেক সময় চলে আসে, যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। সৈকতও এই মুহুর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ও ফজলুল হককে কী বলবে, তা ঠিক করতে পারছে না। ফজলুল হক ওকে তাগিদ দেবার মত করে বললেন,
‘সময় নষ্ট করার সময় আমার নেই, সৈকত। তুমি কি আমার সঙ্গে থাকতে চাচ্ছো না?’
‘ফজলু ভাই, আমাকে কয়েকদিন সময় দিন। আমি ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে চাই।’
সৈকতের কথায় যেন হতাশ হলেন ফজলুল হক। তিনি বেশ কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে রইলেন সৈকতের মুখের দিকে। যেন সৈকতের ভেতরের গোপন কথা পড়ে নিচ্ছেন। সৈকত অস্বস্থিতে বললো,
‘আমি দু’ সপ্তাহ পর জানাবো আমার সঙ্গে থাকবো কিনা। আপনি কী রাগ করবেন?’
‘না, না। রাগ করবো কেন? তুমি তো সময় নিতেই পারো। ভেবে দেখো, এরপর আমাকে জানিয়ো।’

বললেন ফজলুল হক। সৈকতের মনের উপর থেকে যেন অস্বস্থির অনড় পাথর সরে গেল। ও আগের মতই মাথা নুইয়ে ফজলুল হককে পা ছুঁয়ে সালাম করলো। ফজলুল হক ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বললেন,

'সৈকত, তুমি তাহলে আজকের মিটিংয়ে থেকো না। আর এই মিটিংয়ের কথা কাউকে বলো না। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। ঠিক আছে?'

'জ্বি, আচ্ছা। ফজলু ভাই, আপনি রাগ করলেন না তো?'

'আরে না, না। রাগ করবো কেন? তবে তোমার উপর আমার ব্লাইন্ড কনফিডেন্ট ছিল।'

'জ্বি, এই জন্য আমি খুব লজ্জা পাচ্ছি।'

'আরে থাক ওসব। তমি চলে যাও। পরে আমাকে ফোন করো। কেমন?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো সৈকত। ফজলুল হক দরোজা খুলে দিলেন। অনেকটা অপরাধীর মত সৈকত ভেতরের রুম থেকে বের হয়ে এলা। সে ড্রয়ংরুমের উপর দিয়ে মোতালেব হোসেনের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার সময় বিভিন্ন দলের নেতারা ওর এই ফিরে যাওয়ার দৃশ্যকে যেন উপক্ষোর চোখে দেখছিল। ওর মন বিষন্ন হয়ে গেল। ও মনে মনে ভাবছলো ফজলুল হকের ডাকে সাড়া দিতে পারলো না, অথচ তার কথাগুলো অযৌক্তিক নয়। 'কেন ওর মন বর্তমান সরকারকে সমর্থন দিতে চাচ্ছে না?' ও নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলো। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপগুলোকে ও সমর্থন করছে, অথচ সরকারের পক্ষে সক্রিয় হতে মন সায় দিচ্ছে না। কেন? এই প্রশ্ন ওর চিন্তায় এখন যেন গোল্লাছুট খেলছে। ও আনমনে হাঁটছিল। মোতালেব হোসেনের বাড়ির গেট পেরুতেই একদল পুলিশ ওর পথ আটকে দাঁড়ালো। ও প্রথমে কয়েকমুহূর্ত বুঝতে পারেনি পুলিশ ওর পথ আটকে দাঁড়িয়েছে কেন। একজন পুলিশ অফিসার কর্কশ গলায় ওকে বললো,

'স্টপ! ডোন্ট মুভ!'

সৈকত দাঁড়িয়ে পড়লো। পুলিশ অফিসার বললো,

'পালানোর চেষ্টা করবেন না!'

সৈকত বুঝতে পারলো পুলিশ ওকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছে। পুলিশ ওকে ঘিরে ফেলেছে। দৌড়ে পালিয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই। কেয়ার কথা মনে পড়লো ওর। সৈকত কিছুই বললো না। ধানমন্ডি থানার সেকেন্ড অফিসার জাকির হোসেন ওর মুখোমুখি এসে এবার নরোম গলায় বললেন,

'সৈকত সাহেব, আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু থানায় যেতে হবে। কোন ঝামেলা করার চেষ্টা করলে ক্রস-ফায়ারে পড়ে যেতে পারেন!'

পুলিশ এখন কথায় কথায় ক্রস-ফায়ারের ভয় দেখায়। যত ভয়, তত আয়-জানে সৈকত। ও শান্ত গলায় বললো,

'ঠিক আছে, চলুন থানায় যাই। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ জানতে পারি?'

এ কথায় সেকেন্ড অফিসার মুচকি হাসলেন। বললেন,

'অভিযোগ অনেক। রাজনীতির নামে রাষ্ট্রের ক্ষতি করছেন, এটা হচ্ছে একটি বড় অভিযোগ। আপনার আচরণের উপর নির্ভর করছে আর কত অভিযোগ উত্থাপিত হবে।'
'আমি বুঝতে পেরেছি। চলুন। আমাকে কি হাতকড়া লাগাবেন?'
'আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে সহজেই পরিস্থিতি বুঝে নিয়েছেন। আপনাকে হাতকড়া লাগালাম না। তবে চালাকি করবেন না। চলুন, গাড়িতে উঠি।'
পুলিশের ভ্যান রাস্তার পাশেই ছিল। সৈকত পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে ঐ ভ্যানে গিয়ে উঠলো। গাড়িতে ওঠার সময় ওর মোবাইল ফোন বেজে ওঠলো। সেকেন্ড অফিসার জাকির হোসেন ওর শার্টের পকেট থেকে ফোনটি বের করে নিজের কাছে নিয়ে নিল। ফোনটি বাজছিল, তিনি ফোন অন করলো।
'হ্যালো, কাকে চাই? কী, সৈকত? উনি ব্যস্ত আছেন? কী বললেন..আপনি অহনা? আপনাকে বললাম না উনি ব্যস্ত আছেন! উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না, অর্থাৎ কথা বলতে চাচ্ছেন না। আহা! আপনি বুঝতে পারছেন না কেন? ঠিক আছে, তাকে বলবো আপনাকে যেন ফোন করেন। এখন রাখছি। আমি? আমি উনার শ্বশুড়বাড়ির লোক!'
এ কথা বলে ধানমন্ডি থানার সেকেন্ড অফিসার জাকির হোসেন ফোনের লাইন কেটে দিল। এরপর সে সৈকতের দিকে তাকিয়ে 'হো হো' করে হাসতে লাগলো। সৈকত ভীষণ অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর ভেতরে রাগের একটা দমকা হাওয়া বয়ে যচ্ছে। এই সেকেন্ড অফিসার জাকির হোসেনকে যদি ও কখনো সাদা পোষাকে পেয়ে যায়, সেদিন তাকে ও কষে দুই চড় লাগাবে। এরপর মহিলাদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলার জন্য ওর কান ওকে দিয়ে ধরিয়ে এক শ' একবার উঠ-বস করাবে-সৈকত মনে মনে শপথ নিয়ে নিল । ওর প্রশ্ন জাগলো সরকার দেশের এতো বিভাগে শুদ্ধি অভিযান চালালেও পুলিশ বিভাগে এমন অভিযান চালায়নি কেন? সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে আরেকটি প্রশ্ন জেগে ওঠলো, 'পুলিশ বিভাগে কি একজন সৎ ও বিনয়ী ব্যক্তি আছেন?' ধানমন্ডি থানায় যেতে যেতে এই প্রশ্নটাই বারবার ভেসে ওঠছিলো ওর মনে।

এগার

মাত্র তিনমাস। তিনমাসে অনেকের জীবনে কিছুই বদলায় না, আবার কারো জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন চলে আসে। হয়তো কেউ তিনমাসে একটুও এগুতে পারে না, কেউ আবার অনেক এগিয়ে যায়। কখনো কখনো একটি দেশের সরকারও পরিবর্তন হয়ে যায়। সৈকতের জীবনে গত তিনমাসে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের শুরু হয়েছে হঠাৎ করে। রাজনৈতিক কারণে কারাবাস ওকে বদলে দিতে সাহায্য করেছে। একমাস কারাবাসের পর জেল থেকে বেরিয়ে সৈকত রাজনীতি থেকে দূরে সরে যায়। প্রথমে ব্যবসা করার কথা ভাবলেও ও চাকরি জুটিয়ে নেয়। রাজনীতি ছেড়ে চাকরি করবে, এটা ও কখনো ভাবেনি। যেমন ভাবেনি অকারণে জেল খাটার কথা। ঝিকাতলায় মোতালেব হোসেনের বাড়ির সামনে থেকে যেদিন ওকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল, সেদিনই ও বুঝে নিয়েছে রাজনীতির পথে

অনেক চড়াই-উৎড়াই রয়েছে। অতীতের অনেক সরকারের মত বর্তমান সরকারও ওকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করেছিল। ওর বিরুদ্ধে কোন মামলা ছিল না। তবু ওকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে এক মাসের ডিটেনশন দেয়া হয়। ওকে অসহায়ভাবে অকারণ কারাবাস মেনে নিতে হয়েছিলো। রাজনীতির কুফল বলে কথা। সৈকত অতো বড় রাজনীতিবিদ নয়, অথচ সরকারের কাছে ওর গুরুত্ব কেন বেশি-ও তা জানে না। ওর কারাবাসের অভিজ্ঞতা এটাই ছিল প্রথম। ওকে গ্রেফতার কবার পর পুলিশ অনেকগুলো মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে চেয়েছিল। হয়তো ও ফেঁসেও যেত। কিন্তু এবারও ওকে এই যাত্রা থেকে রক্ষা করেন ফজলুল হক। ওকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসেন তিনি। প্রথমে এই ব্যাপারটায় গভীর রহস্যের মধ্যে পড়ে যায় ও। যার ইঙ্গিতে ও গ্রেফতার হলো, সে-ই আবার মামলার বেড়াজাল থেকে ওকে বের করে নিয়ে আনলেন। এই রহস্য উন্মোচন করতে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ও সোজা চলে গিয়েছিল ফজলুল হকের বাড়ি। ফজলুল হকও ওর জন্য যেন অপেক্ষা করছিলেন। সৈকতকে দেখামাত্র হেসে বলেছিলেন,

'আমি জানি, তুমি আমার কাছে আসবে। এবং জানতে চাইবে কেন তোমাকে জেল থেকে বের করে আনলাম।'

সৈকত শান্তচোখে বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকেছিল। এরপর ও বলেছিল,

'আমাকে গ্রেফতার করিয়ে দিলেন। আবার জেল থেকে বের করে আনলেন। জানতে পারি কি, এটা কোন ধরনের রাজনীতি?'

এ কথায় মৃদু হেসে ফজলুল হক বলেছিলেন,

'এটা-ও এক ধরনের রাজনীতি। এই রাজনীতির প্রচলন আছে, কিন্তু এর কোন নাম নেই।'

সৈকত প্রশ্ন করেছিল,

'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? মামলা, জেল-জুলুম দিয়ে আমাকে আপনাদের দলে ভিড়াতে চাচ্ছেন?'

একটু চুপ থেকে ফজলুল হক ওর চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন,

'সৈকত, তোমার প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। তারওপর আমার মেয়েও তোমাকে পছন্দ করে। তাই আমি তোমাকে জেল থেকে বের করে এনেছি। তোমাকে জেল থেকে বের করতে আমাকে কতটা কাঠ-খড় পুড়তে হয়েছে, তা তুমি জানো না। তোমাকে ওসব কথা বলতেও চাই না। তবে আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিতে চাই।'

'উপদেশ?'

'হ্যাঁ, উপদেশ। সৈকত, তুমি রাজনীতি ছেড়ে দাও। ব্যবসা শুরু করো। চাকরিও করতে পারো। আমি তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবো।'

ফজলুল হক কথা বলার সময় তার কণ্ঠ কেমন কেঁপে উঠলো। সৈকত তার আবেগকে সম্মান দেখিয়ে শান্ত গলায় বলেছিলো,

'ধন্যবাদ। তবে আপনার সাহায্য ছাড়া যেন চলতে পারি, সে চেষ্টা করবো।'

ফজলুল হক যেন লজ্জায় কুকড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

‘আমার প্রতি তোমার রাগ একদিন থাকবে না-এটা আমি জানি। অন্য কোন সময়ে, অন্য কোন পরিস্থিতিতে তোমাকে হয়তো সেদিনের কথা বলতে পারবো।’
‘আমার আর আগ্রহ নেই। তবে আপনাকে একটা কথা বলে বিদায় নিতে চাই।’
‘বলো।’
‘অনেক সাধারণ মানুষের মত এই দেশ নিয়ে আমার একটা স্বপ্ন আছে।’
‘কি স্বপ্ন?’
‘সুস্থ রাজনীতি ও সঠিক নেতৃত্বের একটি বাতিঘর একদিন আমরা পেয়ে যাবো-এমন একটি স্বপ্ন আমি দেখি।’
‘বাতিঘর!’
‘হ্যাঁ, বাতিঘর। এই বাতিঘর অন্ধকারঘন রাজনীতির পথে আমাদের আলোর দিশারী হয়ে পথ দেখাবে। দুর্নীতি, শোষণ, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনার জঞ্জাল পরিস্কার করে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব দেশকে নিয়ে যাবে উন্নয়নের ধারায়। এমন দিনের স্বপ্ন আমি প্রতিনিয়ত দেখি। বলতে পারেন, এমন স্বপ্নের ঘোরেই আমি থাকি।’
এ কথায় হেসে ফজলুল হক বলেছিলেন,
‘তোমার স্বপ্নের সঙ্গে আমার স্বপ্নের কোন অমিল নেই। পার্থ্যক্যও নেই। অমিলটা হচ্ছে পথ ও সময়ের। এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।’
এ পর্যন্ত সৈকতের কথা হয়েছিল ফজলুল হকের সঙ্গে। সৈকত বাড়ি ফিরে গিয়ে সাতদিন কোথাও বের হয়নি। ওই সাতদিন ও নিজেকে নিয়ে অনেক ভেবেছে। নিজেকে বদলে নেবার জন্য প্রস্তুত করেছে। এরপর সৈকত আর পার্টির কার্যালয়ের দিকে যায়নি। কোন সভাতেও যোগ দেয়নি। পার্টির সকল পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। ও চাকরির আবেদন করতে থাকলো বিভিন্ন কোম্পানীতে। একসময় ইন্টারভিউ’র ডাক পেল স্কয়ার ফার্মাসিটিক্যাসল কোম্পানী থেকে। এক ইন্টারভিউতেই স্কয়ার কোম্পানীতে চাকরি হয়ে গেল ওর। চাকরি জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ও। পরিবর্তন এলো ওর দৈনন্দিন রু-টিনেও। সৈকত আগে দেরিতে ঘুম থেকে উঠতো এবং অনেক রাতে বাড়ি ফিরতো। পার্টি অফিস, সভা, এখানে সেখানে আড্ডা-এসব ছিল ওর দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র। এখন ন’টা পাঁচটা অফিস আর ইন্টারনেটে বিশ্বের তাবৎ খবরে ডুবে থাকে ও। আগে হাতে কখনো পোষ্টার, কখনো ব্যাগ বা কখনো বই নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। এখন অফিসিয়াল ব্রিফকেস বা কখনো লেপটপ থাকে ওর হাতে। পোশাক-আশাকের পরিবর্তনটাও চোখে পড়ার মত। নিজেকে সব সময় পরিপাটি রাখে ও। তিনমাস আগে যে ওকে দেখেছে, এখন সে ওকে দেখে হচকিয়ে যাবে। কয়েক মুহুর্ত ওকে চিনতেও কষ্ট হতে পারে কারো।
সিংগাপুরের আন্তর্জাতিক চাংকি বিমানবন্দরে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিজের পরিবর্তন নিয়ে ভাবছিল সৈকত। ও সিংগাপুরে এসেছিল রিসার্চ কর্মকর্তা হিসাবে একটি ওয়ার্কশপে অংশ নিতে। কোম্পানী ওকে পাঠিয়েছে। রিসার্চ কর্মকর্তা হিসাবে স্কয়ারে যোগ দিলে বেশ কয়েকটি ওয়ার্কশপে অংশ নিতে হয়। এই ওয়ার্কশপে বিশ্ববাজারের বিভিন্ন ওষুধ সম্পর্কে

তথ্য-উপাত্ত জানানো হয়। ওয়ার্কশপ শেষ করে সিংগাপুর থেকে ঢাকায় ফিরছে সৈকত। বিমানবন্দরের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে নিজেকে নিয়ে ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছিল ও। ওর ভাবনা ভেঙ্গে গেল একটি মেয়ের প্রশ্নে। সৈকত দাঁড়িয়েছিল বিমান বন্দরের ফুড সার্ভিস এলাকায় স্টারবাগস কফি শপের সামনে। ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি মেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েটি ওর সামনে দাঁড়িয়ে কৌতুহলী গলায় জিজ্ঞেস করলো,

'এক্সকিউজ মি, আর ইউ বাংলাদেশী?'

মেয়েটির প্রশ্নে একটু চমকে গেল সৈকত। ও তাকালো মেয়েটির দিকে। মেয়েটি বাংলাদেশী হলেও ওর পোশাক-আশাকে বোঝা যাচ্ছে ও বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোন দেশে থাকে। পড়েছে সাদা রঙের শর্ট স্কার্ট এবং লাল রঙের টপস। পায়ে হাইহিল। ববকাট চুল। সানগ্লাস বুকের টপসের উপর ঝুলে আছে। মেয়েটি মিষ্টি হেসে ফের বললো,

'আপনি কি বাংলাদেশী?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'আর ইউ মিঃ সৈকত?'

মেয়েটির এই প্রশ্নে অবাক হলো ও। সৈকত দুই সপ্তাহ ছিল সিংগাপুরে। এই দুই সপ্তাহে ওকে কেউ প্রশ্ন করেনি 'আর ইউ মিঃ সৈকত?' সিঙ্গাপুরে ওকে কেউ চিনবে-এমন আশা ও করেনি। কিন্তু আজ দেশে ফেরার সময় বিমানবন্দর লাউঞ্জে একটি অচেনা মেয়ে ওকে প্রশ্ন করছে, 'আর ইউ মিঃ সৈকত?' সৈকত কয়েক সেকেন্ড কোন কথা বলতে পারলো না। মেয়েটি ফের বললো,

'আই থিংক, আমি যাকে চিনি, আপনি সেই সৈকত নন। বাট ইউ আর লুক লাইক!'

সৈকত নিজেকে ধাতস্থ করে বললো,

'ম্যা বি ইউ আর রাইট। বাট আই এ্যাম সৈকত অলসো।'

'রিয়েলি!'

'বাট আই ডোন্ট নো, হু আর ইউ?'

'আই নো, ইউ ডোন্ট নো মি। ইউ নেভার সি মি।'

এ কথা বলে মেয়েটি খিলখিলিয়ে হাসতে লাগলো। সৈকত অস্বস্থিতে পড়ে গেল। মেয়েটি হাসি থামিয়ে বাংলায় বললো,

'আমি আপনার ছবি দেখেছি। ছবির সঙ্গে আপনার অনেক অমিল দেখছি!'

এ কথায় ভাবনায় পড়ে গেল সৈকত। ও বুঝতে পারছে না মেয়েটি কে, অথচ মনে হচ্ছে মেয়েটি ওর কথাই বলছে। ওর পরিবর্তনের কথাটাও বলছে মেয়েটি। ও বললো,

'আপনি কে? আমি কি আপনাকে চিনি?'

মেয়েটির মুখে হাসির রেখা ফুটে রয়েছে। ও সৈকতের দৃষ্টিতে দৃষ্টি চোখ রেখে কপালের ভ্রু নাচিয়ে বললো,

'আমার নাম রায়না!'

'রায়না' নামটি শোনামাত্র সৈকতের ভেতরে একটা ধাক্কা এসে লাগলো। ও হচকিয়ে গেল। রায়না ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। যেন সৈকতকে চমকে দিয়ে ও খুব মজা পাচ্ছে। সৈকত রায়নার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এখন ওর মনে হচ্ছে অহনার চোখের সঙ্গে ওর চোখের মিল রয়েছে। অহনার শরীর পাতলা, রায়নার শরীর ভারী। অহনা শান্ত, রায়না চঞ্চল। অহনা কথা বলে দৃষ্টি নামিয়ে, রায়না কথা বলে চোখে চোখ রেখে। অহনা অর্ন্তমুখি, রায়না সপ্রতিভ। কয়েক মুহুর্তেই অহনা ও রায়নার পার্থক্য বের করে ফেললো সৈকত। সৈকত জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলো 'অহনা কেমন আছে?'। প্রশ্নটি করার আগে রায়না বললো,

'আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছেন?'

'হয়েছি। তবে..।'

'তবে অহনাকে দেখলে বেশি খুশি হতেন, এইতো ?'

এ কথা বলে মুচকি হাসলো রায়না। সৈকত নিজের মধ্যে একটু ধাতস্থ হয়ে বললো,

'আপনার এই ধরনা কেন?'

'অহনার কাছ থেকে আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে আপনি অহনাকে পছন্দ করেন।'

রায়নার কথায় বিব্রত হলো ও। সহজভাবে ওর দুর্বলতার কথা রায়না বলে দিয়ে ওকে মৃদু লজ্জায় ফেলে দিল। ও এ লজ্জা সামলে নিয়ে বললো,

'অহনা বুঝি আমার সম্পর্কে এই ধারনা নিয়ে বসে আছেন?'

'ধারণা কি মিথ্যা?'

'এ নিয়ে তর্ক করতে চাইনা। এবার বলুন তো, আপনি এখানে কেন?'

এ প্রশ্নে আবারো মুচকি হাসলো রায়না। ও বললো,

'এই তো আমরা সিংগাপুরে এসেছিলাম হলিডে ভেকেশনে।'

'আমরা মানে? আপনি আর..?'

'আমি আর অহনা।'

সৈকতের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠলো। অহনা কি তবে আশেপাশে কোথাও রয়েছে? তিনমাস অহনার সঙ্গে ওর যোগাযোগ হয়নি। সৈকত নিজে কখনো অহনাকে ফোন করেনি। জেলে যাওয়ার লজ্জার কারণে এক ধরনের সঙ্কোচে ও অহনাকে ফোন করেনি। ও ভেবেছিলো, অহনাকে ফোন করে ওর খোঁজ নেবে। কিন্তু অহনাও ওকে ফোন করেনি। এ নিয়ে সৈকতের মনে অভিমান জমে আছে। অহনা কেন ওকে ফোন করেনি, এই প্রশ্ন ওকে খুঁচিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। অহনার এই অকারণ নীরবতা ওকে অপমানের কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। অপমানের কষ্ট নিয়ে ও কেন অহনাকে যেচে ফোন করবে? এই কারণেও সৈকত অহনাকে ফোন করেনি। কিন্তু অহনার ফোন আসবে, এমন একটা ঘোরলাগা স্বপ্ন ও অবচেতন মনে আঁকতো মাঝেমাঝে। আবার স্বপ্নটা তাৎক্ষণিক ঝেড়ে ফেলে দিত মন থেকে। মাঝেমাঝে স্বপ্নটা ফুটে উঠতো মনের ক্যানভাসে। এটা এক ধরনের কষ্টের স্বপ্ন। এই মুহুর্তেও এই স্বপ্নটা ঝিলিক দিয়ে ওঠলো ওর মনে। ওর মনে হচ্ছিলো নিশ্চয় অহনা আশেপাশে কোথাও

রয়েছে। যে কোন সময় অহনার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যাবে। সৈকত নিজের ভেতরে মিহিন তোলপাড় টের পাচ্ছে। রায়না সৈকতের নীরবতা দেখে বললো,

'আপনি দেখছি, কেমন হা হয়ে গেছেন, মিঃ সৈকত!'

রায়নার কথায় সম্বিৎ ফিরে পেল সৈকত। ও বললো,

'জ্বি, আমি ঠিক ভাবতে পারছি না কিছু। ঠিক মেলাতে পারছি আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আবার দেখা হয়ে যাবে অহনার সঙ্গে। তাই..।'

'তাই, এক মুহর্তেই ইমোশোনাল হয়ে যাবেন? আপনি তো দেখছি, অহনার নাম শোনামাত্র কেমন লাল হয়ে গেছেন! হোয়টাস হ্যাপেনড ইন ঢাকা উইথ অহনা?'

এ কথা বলে রায়না আবার খিলখিলিয়ে হেসে ওঠলো। কে বলবে এই মেয়েটি কয়েক মাস আগে জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতারণার কষ্ট পেয়েছে। সৈকত অস্বস্থি প্রকাশ করে বললো,

'কী যে বলেন! আপনি রসিকতা করতে বুঝি খুব পছন্দ করেন?'

অবারও হাসলো রায়না। রায়না কথায় কথায় হাসে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, ও ভীষণ হাসি-খুশি এক মানুষ। অথচ ও প্রবঞ্চনা এক দগদগে ঘা চেপে আছে! সৈকতের খুব ইচ্ছে করছে রায়নার প্র্যাগন্যন্সির কথা জানতে। কিন্তু এই প্রশ্ন কি ওকে করা শোভনীয় হবে? রায়নাকে দেখে ওকে প্র্যাগন্যান্ট বলে মনে হচ্ছে না । রায়না সৈকতকে বললো,

'বাই দ্যা ওয়ে, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমি ঢাকায় ফিরছি।'

'রিয়েলি! গুডস এনাফ! অহনা তো কিছুক্ষণ আগে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। কিছুক্ষণ আগে দেখা হলে তো ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যেত।'

রায়নার এ কথায় মন খারাপ হতে লাগলো সৈকতের। ও মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো,

'ঠিক বুঝলাম না। অহনা ঢাকায় গেল, কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমি সিডনী যাচ্ছি। অহনা বিশেষ কাজে ঢাকায় যাচ্ছে। আমরা দু' বোন এক সপ্তাহ বেড়ালাম সিংগাপুরে। এখন আমি সিডনীতে ফিরে যাচ্ছি। আমার ফ্লাইট দু' ঘন্টা পর। আপনার?'

রায়নার কথায় সৈকত বুঝতে পারলো অহনার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ নেই। ওর বুকের ভেতরের কাঁপুনি কমে আসছে। ও সঙ্কোচ নিয়ে প্রশ্ন করলো,

'অহনা ঢাকায় গেল কেন? কয়দিন থাকবেন, বলতে পারেন?'

মুচকি হেসে রায়না বললো,

'সত্যি কথা বলতে কি, অহনার জন্য একটি বিয়ের প্রস্তাব এসেছে ঢাকা থেকে। ও যাচ্ছে পাত্রের সঙ্গে কথা বলতে। বলতে পারেন পাত্র দেখতে। ও হয়তো ঢাকায় সাতদিন থাকবে।'

রায়নার শেষ কথা যেন শোনতে পেল না সৈকত। ওর মধ্যে কম্পন হচ্ছে। ওর কান দিয়ে যেন কামানের গোলার মত রিপিট হয়ে প্রবেশ করেছে 'ও যাচ্ছে পাত্রের সঙ্গে কথা বলতে।'

সৈকত নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে বললো,

'ঠিক আছে, অহনাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলে খুশি হবো।'

'অবশ্যই জানিয়ে দেব। তাছাড়া আপনার সঙ্গে যে আমার দেখা হয়ে গেছে-এ কথা তো ওকে সবার আগে জানাবো। ও ঢাকায় পৌঁছে আমাকে ফোন করবে। আপনার ফ্লাইট কখন?'
'এইতো আর ৩০ মিনিট পর। আমাকে এখুনি যেতে হবে। সর্বশেষ নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হতে হবে।'
'তাহলে এখুনি চলে যান। আপনার আর দেরী করা ঠিক হবে না।'
রায়নার কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলো সৈকত। ও বিদায় নেবার জন্য বললো,
'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগছে।'
'আমারও। আর হ্যাঁ, আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'
'কেনো?'
'রাতুলকে খুঁজে বের করে দেবার জন্য।'
এ কথা বলার সময় রায়নার কণ্ঠ ভারী হয়ে গেল। সৈকত এর জবাবে শুকনো হাসি হাসলো। ও পা বাড়ালো নিরাপত্তা তল্লাশীর গেটের উদ্দেশ্যে। পেছন থেকে রায়না বললো,
'ঢাকায় পৌঁছে অহনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'
এ কথায় ঘুরে দাঁড়ালো সৈকত। কৌতুহল প্রকাশ করে বললো,
'কেনো?'
রায়না হেসে বললো,
'এই 'কেনো'র উত্তরটা আপনি নিজের মধ্যে খুঁজুন।'
এ কথা বলে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে রায়না পা বাড়ালো অন্যদিকে। সৈকত রায়নার চলে যাবার পথে চেয়ে রইলো কয়েকমুহূর্ত। এরপর ও ছুটলো সিংগাপুর এয়ারলাইন্সের গেটের দিকে। ওর মনে হচ্ছে ঢাকায় দ্রুত যেতে হবে। অহনার মুখোমুখি হতে হবে ওকে। হেরে যাবার আগে হেরে যাবার কারণ ওকে জেনে নিতে হবে। ও কেনই বা হেরে যাবে? প্রশ্নটা ওকে ভাবিয়ে তুললো। এরপর থেকে ওর ভেতরে কেন জানি জয়ী হবার জেদ পেখম ছড়াতে লাগলো। এরকম কখনো হয়নি ওর।

বার

ঘুম ভাঙার পর থেকেই সৈকত ছটফট করছিলো। সকাল থেকেই অস্বস্তি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং এক ধরনের উত্তেজনা ওর মনে। ও ধারণা ছিল অহনার টেলিফোনে ওর ঘুম ভাঙবে। কিন্তু অহনার ফোন আসেনি। অহনার ফোনের অপেক্ষার কষ্ট নিয়ে ও বাড়ি থেকে বের হয়। অফিসে আসার পর থেকে কাজে ওর মন বসেনি। অস্বস্তি আর কৌতুহলে অহনার খবর জানতে ও সুমনকে ফোন করেছিল সুমনের সেলফোনে। সুমন ফোন ধরেনি। ও ম্যাসেজ রেখেছে। সুমন এখনো কল ব্যাক করেনি। হয়তো ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত রয়েছে। কাজে ব্যস্ত থাকলে ও অনেক দেরীতে ফোন করে। এখন মধ্য দুপুর। দিনটি দুপুরে গড়াতেই আজকের দিনটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে অস্বস্তিকর ও খারাপ দিন হিসাবে ধরে নিল সৈকত।

এর মধ্যে ও দিনটিকে ‘অপয়াদিন’ বলে কয়েকবার মনে মনে গালি দিয়ে ফেললো। অফিসের কাজে মন বসাতে পারছে না ও। অহনার সেলফোন নম্বর জানে না সৈকত। জানলে ও অহনাকে ফোন করে ফেলতো। চেয়ারে হেলান দিয়ে অহনার কথা ভাবছিল ও। দরোজায় নক হলো। ও সর্তক হয়ে বললো,
‘কান ইন।’
সৈকতের রুমে প্রবেশ কররো ওর অফিস সহকারি কাদের। কাদের বললো,
‘স্যার, আপনার সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন। ভেতরে আসতে বলবো?’
কাদের মিয়ার কথায় সটান হয়ে বসলো ও। এ সময় ওর সঙ্গে কে দেখা করতে আসতে পারে? কেয়া নয়তো? ইদানিং কেয়া ওকে খুব ফোন দিচ্ছে। ও কেয়ার ফোন ধরছে না। কেয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ও রাখতে চায়নি। কেয়াও বেশ কিছুদিন ফোন করেনা। ইদানিং ফের ও ঘন ঘন ফোন করছে। কেয়ার মধ্যে ‘হু কেয়ারস’ ভাব আছে। এই ভাবের কারণে ও চলে আসতে পারে ওর অফিসে। এ কথা ভাবতেই ওর গলা শুকিয়ে এলো। ও শুকনো গলায় কাদের মিয়ার উদ্দেশ্যে বললো,
‘তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।’
কাদের মিয়া মাথা নেড়ে ওর রুম থেকে বের হয়ে গেল। সৈকতের টেনশন অনুভব করতে লাগলো। নতুন চাকরি। এখনই ওর কাছে মেয়ে বা নারীর আগমন কলিগরা কি চোখে দেখবে, কে জানে। সৈকত অন্যরকম অস্বস্থিতে চেয়ে রইলো ওর রুমের প্রবেশের দরোজার দিকে। কয়েকমুহূর্ত যাবার পর দরোজা ঠেলে ওর রুমে প্রবেশ করলো অহনা। বিস্ময়ে থ’ হয়ে গেল সৈকত। অহনা ওর অফিসে চলে আসতে পারে, এমন কথা ও স্বপ্নেও ভাবেনি। ও স্বপ্ন দেখছে না তো? অহনার মুখে স্মিত হাসি। ও এক পা, দু পা করে এগিয়ে ওর টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারে এসে বললো,
‘বসতে পারি?’
‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন!’
‘ধন্যবাদ।’
বলে অহনা বসলো সৈকতের টেবিলের বিপরীতে রাখা চেয়ারে। সৈকতরে ঘোর কাটছে না। ওর মুখে কোন কথা ফুটছে না। ও হা করে তাকিয়ে আছে অহনার মুখের দিকে। অহনা নিচু গলায় বললো,
‘অমন হা করে তাকিয়ে আছেন কেন?’
‘না, মানে, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আপনি আমার সামনে!’
‘কেন আমি কি আসতে পারি না?’
‘তা পারবেন না কেন? কিন্তু..!’
‘কিন্তু কি?’
‘আমি ভীষণ সারপ্রাইজড..!’
‘কেন?’

'আপনাকে দেখে।'
'এর আগে কি আমাকে দেখেননি?'
এর জবাব দিল না সৈকত। ও কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। অহনাকে অনেক কথা বলার আছে। অভিমান ভেজা কিছু প্রশ্নও আছে। কীভাবে এবং কোথা থেকে কথা শুরু করবে, তা ঠিক করতে পারছে না ও। অহনাকে দেখার প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিচ্ছে ও। অহনা ওর রুমের চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে বললো,
'আপনার অফিসটা খুউব সুন্দর!'
'তাই নাকি?'
'হুম। এই চাকরির খবরটা কিন্তু আপনি আমাকে জানাতে পারতেন।'
অহনার কণ্ঠে অনুযোগ। সৈকত নিজেকে নিজের মধ্যে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। অহনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে চায় ও। ও বললো,
'অনেক কিছু চাইলেই কী পারা যায়?'
'যেমন?'
'যেমন ধরুন, এই যে আপনি নীল রঙের জমকালো শাড়ি পড়ে এসেছেন এবং এতে আপনাকে অপ্সরীর মত লাগছে, ইচ্ছে করলেই কি নিজের নিপাট মুগ্ধতার কথা বলে ফেলে যায়?'
এ কথায় স্নিগ্ধ হাসিতে কেমন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠলো অহনা। ও মৃদু হেসে বললো,
'আপনি অনেক বদলেছেন, দেখছি!'
'আপনার চেয়ে বেশি বদলেছি কি?'
'আমি আবার কতটুকু বদলালাম?'
অহনার বিস্ময় দেখে বিস্মিত হল সৈকত। ও বললো,
'এই যে ঢাকা ছাড়লেন, দীর্ঘদিনে একটি ফোনও করেননি। খোঁজ নেননি আমার। এটা কি বদলানো নয়? নাকি এটাই আপনার বৈশিষ্ট্য?'
এই প্রশ্নে একটু চুপসে গেল অহনা। ও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,
'আমি জানি, আপনি এই প্রশ্ন করবেন। এর জবাব দেবার আগে আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই।'
'করুন। আজ আমি প্রস্তুত। প্রশ্ন করুন।'
'আপনিও তো আমাকে ফোন করতে পারতেন। করেননি কেনো?'
অহনার প্রশ্নে একটু ভাবলো সৈকত। এরমধ্যে ও অহনাকে ভালো করে দেখে নিল। অহনা আজ সাজ-সজ্জা করে এসেছে। এর আগে ও কখনো সেজে ওর সামনে আসেনি। অহনাকে ভীষণ আকর্ষণীয় লাগছে। অহনার দিকে তাকিয়ে চোখ সরাতে পারছে না সৈকত। ওর সুবিধা হচ্ছে অহনার মুখোমুখি বসে ও কথা বলছে। সৈকতের নীরবতায় অহনা ফের বললো,
'জবাব দিলেন না যে!'

‘আপনাকে ফোন না করার কারণ তো আছে।’
‘কারণটি বলুন।’
বললো অহনা। সৈকত কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,
‘আপনি কি জানেন, আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম।’
‘হ্যাঁ, অনেক পর এ খবর শুনেছি।’
‘এ ঘটনায় আমি মূষড়ে পড়ি। আপনাকে ফোন করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তাছাড়া আপনিও আমাকে ফোন করেননি বলে অভিমানও জমে যায়।’
‘রাজনীতিবিদরা জেলে গেলে মর্যাদাহানি হয়না বলে শুনেছি।’
অহনার এ কথায় আবারো কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সৈকত। এরপর বললো,
‘হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু আমি এ ঘটনাকে সহজভাবে নিতে পারিনি। এবার আপনার কথা বলুন।’
তাগিদ দিল সৈকত। অহনা কয়েকমুহূর্ত চুপ থেকে গম্ভীরকণ্ঠে বললো,
‘আমি হঠাৎ করে সিডনী চলে যাবার দিন আপনাকে ফোন করেছিলাম। আপনার ফোন কেউ একজন ধরেছিল, তার কথাবার্তা ভীষণ ইনসাল্টিং ছিল।’
সৈকত মুচকি হেসে বললো,
‘তখন আমি পুলিশ কাষ্টডিতে। আমার ফোন নিয়ে পুলিশ অফিসার কথা বলছিল আপনার সঙ্গে।’
‘ও তাই!’
‘হ্যাঁ। শুধুমাত্র এই কারণে আপনি আমাকে ফোন করেননি?’
এই প্রশ্নের জবাব দিল না অহনা। ও বললো,
‘আজ থাক। কৈফিয়ত অন্য একদিন দেব।’
সৈকতের মনে হলো অহনাকে চা বা কফির অফার করা হয়নি। ও বললো,
‘এখন বলুন, কী খাবেন? চা বা কফি?’
‘না, না। কিছুই খাবো না। আপনার কাজের সময় নষ্ট করছি নাতো?
‘নষ্ট হলে হবে। ও সব নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না। আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।’
‘বাহ্ রে, আবার কিসের বোঝাপড়া?’
‘এই যে আমাকে উপেক্ষা করে রইলেন, এর বোঝাপড়া। কেনো উপেক্ষা করেছিলেন?’
‘এর কারণ জানাটা কি খুব জরুরি?’
‘হ্যাঁ। অন্তত আমার জন্য খুব জরুরি।’
অহনা চুপ করে রইলো। যেন এমন কথা আাছে, ও তা বলতে চাচ্ছে না। সৈকত কৌতুহলী চোখ ওর চোখে রেখে প্রশ্ন করলো,
‘চুপ করে গেলেন যে! কারণটি বলুন। আমার কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে করছে।’
অহনা বিব্রত বোধ করছে। ও বিব্রতভাবে বললো,

‘কেয়া নামে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল।’
অহনার কথাটি বজ্রঘাতের মত লাগলো। সৈকতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও বললো,
‘কেয়া আপনাকে কী বলেছিল?’
অহনা মাথা নিচু করে বললো,
‘সব কথা আপনাকে কেন বলবো?’
‘কেয়া যদি কোন ভুল তথ্য দিয়ে থাকে, তাই বলছিলাম..।’
‘সৈকত, আমি জানতে চাই না আপনার এবং কেয়ার সম্পর্কের কথা। ওসব আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।’
অহনা একটু বিরুক্তি প্রকাশ করলো। সৈকত অহনার বিরুক্তি গায়ে মাখলো না। ও নরোম গলায় বললো,
‘তবুও একটা কথা আপনাতে জানাতে চাই। কথাটি হলো আমার জীবনে কেয়ার কোন অস্থিত্ব নেই। ওকে আমি পছন্দ করতাম। ভালোবাসাও ছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কটা গড়ে ওঠেনি।’
‘এ সব কথা আমাকে কেনো বলছেন? আমি কি জানতে চেয়েছি?’
হেসে বললো অহনা। সৈকত বললো,
‘আপনাকে ওসব কথা বলে নিজেকে গ্লানিমুক্ত করছি।’
‘ঠিক আছে, আপনার কথা জানলাম। আরো জানলাম কেয়া নামে কেউ আপনার জীবনের অস্থিত্বে নেই। হয়েছে?’
‘না, হয়নি। আমাকে ফোন করেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে।’
এ কথায় মিষ্টি করে হাসলো অহনা। বললো,
‘শুধু দুঃখ প্রকাশ নয়, এরজন্য দু’হাত জোড় করে ক্ষমাও চাচ্ছি। এবার হয়েছে?’
অহনা দু’হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলো। সৈকত হাসলো। ও বুঝতে পারছে না এবার কী বলবে। অহনাকে ওর মনের কথাটি বলে ফেলা দরকার। কিন্তু এখন সঙ্কোচবোধ করছে। আলোচনায় কেয়ার প্রসঙ্গ চলে এসে সঙ্কোচের দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে। অহনা সৈকতের দিকে তাকিয়ে বললো,
‘আপনি কিন্তু জানতে চাননি আমি আপনার কাছে কেন এসেছি?’
‘হ্যাঁ, তাইতো! কেন এসেছেন?’
‘একটা কাজে আপনার সহযোগিতা চাই।’
‘অবশ্যই সহযোগিতা করবো। বলুন, কী কাজ?’
জোর দিয়ে কথাটি বললো সৈকত। অহনা বললো,
‘আপনি বলেছিলেন, আমি যেন এ দেশে সেটেলড হই।’
‘হ্যাঁ, বলেছিলাম।’
‘আমি এসেছি একজনের সঙ্গে দেখা করতে। আই মীন, একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। পাত্র হিসাবে সে আমার যোগ্য কিনা তা জানতে চাই।’

এ কথা জানে সৈকত। তবু অহনার মুখ থেকে কথাটি শোনতে ওর কষ্ট হচ্ছে। ও বিষন্ন হয়ে গেল। অহনা একটু চুপ থেকে ফের বললো,

'ছেলেটির সঙ্গে আজ বিকেল চারটায় দেখা করবো হোটেল সোনার গাঁ'র লবিতে।'

এ কথা বলে অহনা মাথা নিচু করলো। সৈকত নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে। ও বললো,

'ছেলেটি কি আপনার খুউব পছন্দের?'

এর জবাবে চোখ তুলে তাকালো অহনা। বললো,

'ছেলেটি তো আমি কখনো দেখেনি, এখনই পছন্দের প্রশ্ন আসছে কেন?'

অহনার এই প্রশ্নের জবাবে সৈকত বললো,

'আমার কাছে কী ধরনের সহযোগিতা চান?'

'আমি চাচ্ছি, ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন।'

বললো অহনা। সৈকতেকর মনে হলো ও কষ্টের পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে ওর উপর পড়ছে। ও ঢেকে যাচ্ছে অসংখ্য পাথরে। অহনা কত সহজভাবে ওর সহযোগিতা চাইছে। অথচ সৈকত নিজের ভেতরে ভেঙ্গে চূড়মার হয়ে যাচ্ছে। ও নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছে। ওর ভেতরে মিহিন কষ্টের পাশাপাশি হেরে না যাবার প্রত্যয় টের পাচ্ছে ও। অহনা প্রশ্ন করলো,

'কী, যাবেন না আমার সঙ্গে?'

'অবশ্যই যাবো। আমি সব সময় আপনার পাশে থাকতে চাই।'

এ কথায় কেমন করে তাকালো অহনা। ও বললো,

'তাহলে চলুন, বেরিয়ে পড়ি। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। বাইরে গাড়ি আছে।'

সৈকত একটু হাসার চেষ্টা করলো। বিষন্ন মুখের শুকনো হাসি। অহনার চোখে চোখ রেখে ওর চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে ও। কিন্তু ওর চোখের ভাষা পড়তে পারছে না। অহনা কি সত্যিই পাত্র পছন্দ করতে এসেছে ঢাকায়? পাত্র দেখতে অহনা ওকে সঙ্গে নিচ্ছে কেন? প্রশ্ন বুঁদ বুঁদ করছে সৈকতের মনে। অহনা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, এ সময় সৈকত বললো,

'চলুন, বেরিয়ে যাই। তবে আপনার গাড়িতে যাবো না। আজ আপনাকে নিয়ে কিছুখণ রিকসায় ঘুরবো। আপনার আপত্তি আছে?'

এ কথায় অহনা আবারো মিষ্টি করে হাসলো। ও বললো,

'না, আপত্তি থাকবে কেন? আপনার সঙ্গে তো অনেকবার রিকসায় ঘুরেছি। রিকসায় ঘুরতে আমার ভালোই লাগে।'

অহনার কথায় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সৈকত। ও বললো,

'অবশ্য শীতের দুপুরে শাড়ি পড়ে রিকসায় ঘুরে বেড়ানো কঠিন। পারবেন?'

'ঢাকার শীত এমন আর কী? তাছাড়া গাড়িতে সুয়েটার আছে। নিয়ে নেব।'

সৈকত খুশি হলো। বিকেল চারটা বাজতে এখনো দুই ঘন্টা বাকি। ওর মনে হলো হেরে যাবার আগে জয়ী হবার শেষ একটা সুযোগ হাতে রয়েছে ওর। সময়টা খুবই অল্প, তবু জয়

ছিনিয়ে আনতে হবে। ফুটবল খেলায় এক গোলে পিছিয়ে থাকা কোন দলকে অতিরিক্ত সময়ে যেমন মরিয়া হয়ে লড়তে হয়, সৈকতকেও তেমনি লড়তে হবে এখন। অহনাকে ও হারাতে চায় না, কিছুতেই না। ওরা দু'জন বেরিয়ে পড়লো।

তের

ফেব্রুয়ারির শীতের দুপুর। প্রখর সূর্য কিরণ আছড়ে পড়েছে সর্বত্র। ঝাঁঝালো রোদে শীতের প্রকোপ কমে এসেছে। রিকসায় অহনার পাশে বসে সৈকতের কেমন তন্ময়তা এসে যাচ্ছে। অহনা চুপচাপ মুডে। বেইলী রোডে এসে রিকসা থামিয়ে দু'টো আইসক্রীম কিনলো সৈকত। মেয়ে ও শিশুরা আইসক্রীম পছন্দ করে, এ ধারনা ওর। ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো। আইসক্রীম দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো অহনা। রিকসায় বসে অহনা ও সৈকত আইসক্রীম খেতে লাগলো। রিকসা চলছে। অহনার পাশে বসে সৈকত রিকসায় আগেও চড়েছে। কখনো ওর প্রতিক্রিয়া হয়নি। কিন্তু আজ ওর অনভূতিতে কেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। অহনার শরীর থেকে মাতাল করা মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছে। ওর ভেতরে এক ধরনের তোলপাড় চলছে অনেকক্ষণ থেকে। সৈকতের মনে হচ্ছিলো অহনার শরীরে ওর শরীর স্পর্শিত হয়ে কোন এক মধুর সঙ্গীত রচিত হচ্ছে। এই সঙ্গীতের মূর্ছনা শুধু ওরা দু'জনই উপভোগ করছে। আইসক্রীম খেতে গেলে সৈকতের মুখে আইসক্রীমের গলিত অংশ লেগে যায় বরাবর। এখনও তাই হলো। ও পকেটে রুমাল হাতরাতে লাগলো। এ সময় অহনা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল টিস্যু। অহনা ভালোভাবেই আইসক্রীম খাওয়া সম্পন্ন করেছে। সৈকত টিস্যু দিয়ে মুখ মুছে নিল। অহনা ঘাড় ঘুরিয়ে সৈকতের দিতে তাকিয়ে বললো,

'আমরা কোথায় যাচ্ছি? হোটেল সোনার গাঁ'তেই তো যাচ্ছি,তাইনা?'

'কেন আপনি কি পাত্রকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়ছেন?'

'ছিঃ! আপনি যে কী বলেন!'

এ কথায় হেসে ওঠলো সৈকত। লাজুক চোখে তাকালো অহনা। বললো,

'হাসছেন কেনো?'

'হাসছি আপনার লজ্জা দেখে। আচ্ছা, রায়নার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, জানেন তো?'

'জানবো না কেনো? ও ফোন করে আপনার কথা জানিয়েছে।'

'ও কী বলেছে?'

'বলেছে আপনি একজন ভালো মানুষ ও ভদ্রলোক।'

'আপনার দৃষ্টিতে আমি কেমন?'

'এ প্রশ্ন করছেন কেনো?'

'জানতে ইচ্ছে করছে।'

সৈকতের এ কথার জবাব দিল না অহনা। ও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সৈকত হতাশ হলো না। ও প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললো,

'আচ্ছা, আপনি যাকে দেখতে যাবেন, আই মীন আপনার পাত্র কী করেন?'

‘তিনি চার্টার একাউন্ট্যান্ট। উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যাবেন বলে শুনেছি।’
‘নিশ্চয়, বিত্তবান কেউ হবেন।’
‘ছেলেদের পারিবারিক ব্যবসা আছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে।’
বললো অহনা। গোপন এক দীর্ঘশ্বাস চেপে সৈকত বললো,
‘একটা প্রশ্ন করবো?’
‘করুন।’
‘কেমন পাত্রকে আপনার জন্য যোগ্য মনে করেন?’
এই প্রশ্নে ঘাড় ঘুরিয়ে সৈকতের দিকে তাকালো অহনা। সৈকত একটু বিচলিতকণ্ঠে বললো,
‘খুব কঠিন প্রশ্ন করে ফেললাম?’
‘না, তা কেনো। তবে ভাবছি এই প্রশ্ন কেনো করছেন?’
‘আসলে জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার জীবন সঙ্গী হিসাবে আপনি কেমন একজন মানুষকে কল্পনা করেন। বলতে অসুবিধা আছে, বা সঙ্কোচ বোধ করছেন?’
অহনা ফের মুখ ঘুরিয়ে নিল। ও বললো,
‘আমি মনে করি, শিক্ষিত, মার্জিত, স্মার্ট, দায়িত্ববান ও ব্যক্তিত্ব আছে এমন একজন মানুষকে বিয়ে করা উচিত। তবে সে সঙ্গে তাকে হতে হবে উদার মানসিকতার বন্ধু ভাবাপন্ন এবং সংস্কৃতমনা।’
‘আর?’
‘আর পরোপকারী, নিরাংকারী এবং স্বপ্ন প্রবণ হলে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল।’
‘আরো চাওয়ার কিছু থাকলে কী চাইবেন?’
‘অসম্ভব জ্ঞানী, মেধাবী এবং ঈর্ষণীয় গুণের অধিকারীও হতে পারে।’
‘আরো বলতে বললে?’
‘বলবো বিত্তবান ও প্রভাবশালীও হতে হবে।’
অহনার কথায় একটু ভাবলো সৈকত। এরপর ও বললো,
‘একজন মানুষের এতোগুলো গুণ বা ক্ষমতা কিংবা স্বক্ষমতা আছে, এমন পাওয়া সহজ নয়। তাইনা?’
‘হুম্।’
‘এখন যদি বলি, খুব সাধারণ চাওয়ার মত কাউকে পছন্দ করতে হলে কেমন মানুষ আপনি চাইবেন?’
এই প্রশ্নে অহনা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। হয়তো ও কিছু ভেবে নিল। এরপর ও বললো,
‘আমি মানবিক বোধ সম্পন্ন, সৎ, শিক্ষিত, রুচিবান ও সংস্কৃতমনা কাউকে নিজের জীবন সঙ্গী হিসাবে পছন্দ করতে চাই।’
‘বিত্ত আর প্রভাবশালী না হলেও আপনার পছন্দের তালিকায় ঠাঁই পাবেন যে কোন শিক্ষিত, মার্জিত, সৎ ও সুশীল মানসিকতার যে কেউ?’
‘অফকোর্স!’

জোর দিয়ে বললো অহনা। সৈকতের বুকে জমে থাকা অস্বস্থির পাথর যেন নেমে গেল। ওর ভেতরে এক ধরনের সাহস জেগে ওঠছে। ও নিজের ভেতরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে যেন। ও এবার রিকসাওয়ালার উদ্দেশ্যে বললো,

'এই রিকসা ঘুরাও। মগবাজার যাও।'

রিকসাওয়ালা বললো,

'জ্বে, স্যার। যাইতাছি।'

রিকসাওয়ালা রিকসা ঘুরিয়ে নিতেই অহনা প্রশ্ন করলো,

'মগবাজার কি হোটেল সোনার গাঁ'র কাছে? চারটা কিন্তু হয়ে আসছে।'

সৈকত মুসকি হাসি মুখে ধরে রেখে বললো,

'আমি কিন্তু আপনাকে হোটেল সোনার গাঁয় নিয়ে যাচ্ছি না।'

'হোয়াটস, বলেন কি! কেনো?'

'আমরা এখন বিশেষ একটি স্থানে যাচ্ছি, বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে।'

'কোথায়?'

'মগবাজার, কাজী অফিসে।'

'কাজী অফিসে! কেনো?'

বিস্ময় প্রকাশ করলো অহনা। সৈকত স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে বললো,

'আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, অহনা! এবং আজই। কিছুক্ষণের মধ্যেই!'

সৈকতের কথায় হতভম্ব হয়ে গেল অহনা। ওর শরীর কেঁপে উঠলো। ওর মাথার ভেতরটা চক্কর দিয়ে ওঠলো। ধাক্কা লাগলো ঈন্দ্রীয় শক্তিতে। সৈকতের কথাটি কি ও ঠিকমত শুনতে পেয়েছে? সৈকতের আবেগতাড়ি কণ্ঠ ও আবার শুনতে পেল।

'অহনা, আপনার জন্য পাত্র হিসাবে যে যোগ্যতার কথা বলেছেন, আমি কিন্তু সেই যোগ্যতার বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আমি ঐ যোগ্যতার মাফকাঠিতে নিজেকে বিচার করছি না। আমি আপনাকে চাই ভালোবাসার দাবিতে।'

অহনা কী বলবে বুঝতে পারছে না। ও শরীরের কাঁপুনী বেড়ে যাচ্ছে। ওর কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। সৈকত যেন এই মুহুর্তে লন্ডভন্ড করে দেয়া এক ঝড়। ওর ভেতরের লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে ও, কিন্তু এই ভেঙে যাওয়া ওর ভালো লাগছে। ওর ভেতরে ভয়, আড়ষ্টাতা আর অজানা ভালোলাগার তীব্র স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সৈকত এবার আরো দুঃসাহসী হয়ে অহনার একটি হাত ধরলো। বিদ্যুৎ স্পর্শ হলো যেন অহনার পুরো শরীরে। ও বাধা দিতে পারছে না। অহনার ডান হাতের মুঠো সৈকত ওর দু'হাতের মুঠোতে বন্দি করে বললো,

'তোমাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখে আসছি, এই স্বপ্ন সফল করতে চাই। আমি সর্বান্তকরণে তোমাকে চাই।'

'এ সব কী বলছেন!'

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো অহনা। ও নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়নি। সৈকতের হাতের মুঠো থেকে ওর হাত বের করতে সায় দিচ্ছে না ওর মন। কিন্তু ওর ভেতর থেকে একটা গুমোট কান্নার প্রবল ঢেউ যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। সৈকত অহনার দিকে মুখ নিয়ে বললো,

'আমার দিকে তাকাও, অহনা।'

অহনা তাকালো। ওর দু'চোখে জলের দু'টি ধারা নেমে আসছে। সৈকত এই অশ্রুজলকে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নিল। ও আবেশিত গলায় বললো,

'আমি দায়িত্বশীল স্বামী হবো অহনা। তোমার বন্ধু হবো। তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করে যাবো আজীবন। তোমাকে ভালোবেসে যাবো পাগলের মতো। তোমাকে..!'

'চুপ করো, প্লিজ!'

বললো অহনা। সৈকতকে 'তুমি' সম্বোধন করে কথাটি বলার মধ্য দিয়ে অহনা নিজের অজান্তেই সমর্পণের স্বীকৃতি দিল ওকে। সৈকতের মনে হলো ও চিৎকার করে কেঁদে ওঠে জীবনের সবচেয়ে গভীর আনন্দে। ভালোবাসাকে এভাবে মুঠোবন্দি করার কী যে আনন্দ, ওটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ও অহনার হাত তুলে এনে রাখলো নিজের বুকে। অহনা লাজুক চোখে তাকিয়ে বললো,

'এ সব কি হচ্ছে!'

'প্রলয় এবং সৃষ্টি! একটু পরেই করবো বিয়ে, হবে শুভ দৃষ্টি!'

সৈকতের ছড়ায় না হেসে পারলো অহনা। ওর মধ্যে সৈকতকে নিয়ে এক ধরনের স্বপ্নের ঘোর ছড়িয়ে যাচ্ছে দ্রু-ত। হঠাৎ করেই বদলে যাচ্ছে ওর পৃথিবী। এতো দ্রুত কি আমূল বদলে যায় সবার জীবন? এই প্রশ্ন নিয়ে অহনা অন্যরকম আবিষ্টতায় নিজের মাথা এলিয়ে দিল সৈকতের কাঁধে। ওর মনে হচ্ছে পৃথিবীটা ভীষণ আলোকিত!

সমাপ্ত

২৪ নভেম্বর, ২০০৭